শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ এম, এ

মূল্য একটাকা।

PRINTED BY
[S]ASI BHUSAN PAUL AT THE METCALFE PRESS
at 15, Noyan Chand Datt Street.

PUBLISHED BY
NIHAR RANJAN DAS,
[illegible]8A RAJA DINENDRA STREET, CALCUTTA

উৎসর্গ পত্র।

স্বর্গীয়া ইন্দুবালা দেবীর স্মৃতির উদ্দেশে—

স্নেহের বোন ইন্দুবালা,

শৈশব হইতেই তুমি আমার গল্প শুনিতে ভাল বাসিতে। জানিনা আজ তুমি কোন্ লোকে। কিন্তু যেথায় থাক, গল্পসাহিত্যে আমার এই প্রথম উদ্যম তোমার সাগ্রহদৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। তাই আজ তোমার স্মৃতির উদ্দেশে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা, তোমার রাঙ্গা দাদা।

১লা আশ্বিন, ১৩৩২ সাল।

সূচি পত্র।

চন্দ্রাবাই।

(১)

সে দিন বর্ষার ঘনকৃষ্ণ মেঘগুলি সন্ধ্যার আকাশে একটা গম্ভীর বিষাদের ছায়া আঁকিয়া দিতেছিল; বিরহবিধুরা সন্ধ্যারাণীর বিষাদময়ী মূর্ত্তিতে একটা অবসাদের যবনিকা পড়িয়াছিল, দূরে কোন্ গ্রাম্য পথ হইতে বিরহের করুণরাগিণী ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। এ প্রকার চিত্তচাঞ্চল্যের সময়ে বিরহমথিত হৃদয়ে—"এ ভরা বাদরে, এ মাহ ভাদরে, শূন্য মন্দিরে মোর" বসিয়া থাকিতে বড় বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল; তাই মনটা একটু প্রফুল্ল করিবার জন্য বন্ধুবর অধ্যাপক বসন্তকুমারের বাসায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমাদের আশৈশব বাল্যবন্ধু সুশীলচন্দ্রকে দেখিয়া খুব আনন্দিত ও চমৎকৃত হইলাম। অনেকদিন হইতে তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সম্প্রতি তাঁহার বাসস্থানের কোনও সন্ধান না জানায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। আজ চাতকের মত না চাহিতে জল পাইয়া বিশেষ পুলকিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি দেখিয়া বড় ব্যথিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। সুশীলকে ত আমরা

বাল্যকাল হইতেই ভালরকম চিনিতাম, তাঁহার ন্যায় হাস্যরসিক বন্ধু জীবনে আর কখনও পাই নাই। তাঁর সদা প্রফুল্ল হাসিভরা মুখ দেখিয়া কত দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা পাইয়াছি, কত বুকভাঙ্গা ব্যথা ভুলিয়া গিয়াছি। কই এমনত তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তাই তাঁহার এই অচিন্তিত ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাদের বিস্ময়ের কারণটাও কম ছিল না। যাঁহাকে এ পর্য্যন্ত কখনও অন্যমনস্ক দেখি নাই, কলেজের প্রফেসার আসিতে বিলম্ব হইলে সমস্ত ক্লাসটি যাঁহার গল্পগুজবে সরগরম হইয়া থাকিত, আজ সহসা তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্যের রেখা দেখিলে স্বতঃই একটা উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথমে কোন উত্তর পাইলাম না, কিন্তু আমাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অথবা তাঁহার আবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ—

"কে বলে স্ত্রী পুরুষে নিষ্কাম বন্ধুত্ব সম্ভবে না? জীবনে মাঝে মাঝে মানুষ প্রেমের এমন একটা স্তরে আসিয়া পৌঁছে, যেখানে স্বার্থের কলুষ নিশ্বাস বহিয়া প্রণয়ের পেলব কুসুমটিকে ম্লান করিয়া দিতে পারে না, যেখানে কামনার দুষ্টগন্ধ উঠিয়া প্রণয়ের স্বভাবসুন্দর আবহাওয়া নষ্ট করিয়া দেয় না। এমন এক প্রীতির গ্রামে যখন মানুষ উঠিতে পারে, তখন সে সেই অচ্ছেদ্য প্রীতিবন্ধনের ভিতর দিয়াই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, প্রভাতের আলো, আকাশের নীলিমা এবং তাহার মাঝে ইন্দুর হাসি উপলব্ধি করিতে পারে, তখনই তাহার

নিষ্কাম সখ্যভাব সম্ভবপর। আমার জীবনে এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। অহঙ্কার করিতেছি না, আপনাকে সাধারণ মানুষের চেয়ে বড় বলিতেছি না, কিন্তু সত্যি সত্যি মঙ্গলময় ঈশ্বরের এক অখণ্ডবিধানে আমার হৃদয়ে সে নবভাবের ধারা বহিয়াছিল। এখনও আমার সেই অতীত স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় সুখশান্তি লইয়া বর্ত্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

"সেবার এম্ এ পরীক্ষা দিয়া কয়েকটা মাস পশ্চিমে বেড়াইতে যাইব স্থির করিলাম। তারপর আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় নাই। হয়ত তোমাদের মনে আছে আমি প্রয়াগে যাইবার জন্য বড় উৎসুক ছিলাম। এলাহাবাদে আমার এক আত্মীয় থাকিতেন, তাঁর কাছে কিছুদিন থাকিয়া এলাহাবাদ সহরটা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিব ভাবিলাম, তারপর যা হ'ক কপালে থাকিলে আগ্রা দিল্লীটাও বেড়ান হইতে পারে। কিন্তু আসলে আমরা যেমনটি ভাবি তা সেই লীলাময় ঠাকুরটির ইচ্ছায় ঠিক তেমনটি হয়ে উঠে না। আমরা মনে করি আমরা যা স্থির করিব তা যেন কবিতার মিলের মত, ছন্দের গতির মত একটা সুশৃঙ্খল পদ্ধতির অনুসরণ করিবে; কিন্তু তাহা না হইয়া মাঝে মাঝে কোথা হইতে একটা যতিভঙ্গ একটা বেসুরা ধ্বনি আসিয়া পড়ে। আমার ভাগ্যেও ঠিক এমনিতর হইয়াছিল। তখন কিছুদিন পূর্ব্বে এক প্রচণ্ড ঝড়ে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইবার রেলওয়ে লাইনটা স্থানে স্থানে খসিয়া গিয়াছিল। কর্ম্মচারীদিগের অনবধানতায় উহা কর্ত্তৃপক্ষেরা জানিতে পারে নাই।

ঠিক মধ্যরাত্রে দুইটি ট্রেণ দুধার দিয়া আসা যাওয়া করিতেছিল, হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিতে পাইলাম, চারিদিকে ভীষণ গণ্ডগোলের মধ্যে এইটুকু বুঝিলাম যে দুইটি ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়াছে। আমি একলা মানুষ, সঙ্গে জিনিষপত্র তেমন কিছুই ছিল না, চেষ্টা চরিত্র করিয়া নামিয়া পড়িলাম। রাত্রি অধিক হইয়াছে, কিন্তু তখন জ্যোৎস্নাপক্ষ; জ্যোৎস্নাপ্লাবনে উচ্চাবনত বনভূমি হাস্যময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম জনমানবের চিহ্নপর্য্যন্তও নাই, কেবল অদূরে বনপক্ষীর কলধ্বনিমাত্র শোনা যাইতেছে। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, একস্থানে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ঈষৎ চলিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হইল। অগ্রসর হইলাম, দেখিলাম যেন সেই কৌমুদীপ্লাবিতা কাননকুন্তলা বনভূমির উপর বনদেবী অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা যেন সেই উজ্জ্বল নিশীথে নক্ষত্রলোকবিচারিণী কোন জ্যোৎস্নাবালা ধরার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে আসিয়াছেন। দেখিয়া বুঝিলাম বালিকা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল-বাসিনী, বয়স সত্তর আঠারোর কাছাকাছি। মুখে চোখে তার লাবণ্যের এমন একটা দীপ্তি যে তাহাকে স্বতঃ পুণ্যহৃদয়া ও সরলান্তঃকরণা বলিয়া মনে হয়। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম বালিকার পিতা এলাহাবাদের এক প্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী, পিতার সহিত কলিকাতা হইতে ফিরিবার মুখে এই দুর্ঘটনায় এখানে নামিয়া পড়িয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তায় আদৌ সঙ্কোচের ভাব ছিলনা। উন্মুক্তবাতাসে অধিকক্ষণ থাকিলে অসুস্থতাবোধ হইতে পারে এইজন্য আপনা

হইতে আমাকে তাহার সহিত সম্মুখস্থ ভগ্নটাকুরে আসিতে অনুরোধ করিল। আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। হঠাৎ সেই স্তিমিতালোকের আবছায়ায় দেখিতে পাইলাম বালিকার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সাপ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। বালিকাটি দেখিতে পাইয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আমি দুর্গার নাম স্মরণ করিয়া একটা পাথর কুড়াইয়া নিয়া সবলে উহার দিকে নিক্ষেপ করিলাম। ঈশ্বরের করুণা বশেই হউক আর বালিকার পরমায়ুর জোরেই হউক উহা সাপের মাথায় আঘাত করিল, সাপটিও হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া পলাইয়া গেল। বালিকাটি তাহারা আধ আধ হিন্দিবাক্যে তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ক্রমে চারিদিকে উষার অরুণ ছটা দেখা দিল, সেই নবোদিত উষার আলোকে বালিকার রূপজ্যোতি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এইরূপ অনুপম লাবণ্য, এমন আনন্দা স্বাস্থ্য বাঙ্গালা দেশে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। চোখ দুটি যেন কোন্ পুণ্যালোকে বিভাসিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, টানা টানা ভ্রূযুগের উপর ললাটদেশ শরতের আকাশ খণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, দক্ষিণ ভ্রূর উপরে একটা ছোট তিল শরতের আকাশে একটি মেঘের টুকরার মত বৈচিত্র্যে সেই শোভা যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে, বামগণ্ডের একপাশে একটি আঁচিল ক্ষুদ্র তারার মত চিক চিক করিতেছে।

প্রভাত হইয়া আসিল। আমরা তাহার পিতার অন্বেষণে বাহির হইলাম। একা এই পূর্ণবয়স্কা বালিকার সঙ্গে যাইতে আমার বেশ

একটু সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে চোখে সঙ্কোচের কোনও চিহ্নই দেখিলাম না। কিছু দূর যাইয়া আমরা সেখানকার রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশনটা শোন নদীর তীরে নাম ডিরি অন্ সোন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি বালিকার পিতার নাম শ্রীওঙ্কার লাল চতুর্ব্বেদী, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীব। তিনি উদ্বিগ্নচিত্তে ষ্টেশনে কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। বালিকার নিকট রাত্রিসংক্রান্ত সকল ঘটনা শুনিয়া তিনি আমাকে বহুবিধ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তারপর তিনি বলিলেন সোনের তীরটি তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে, তিনি কয়েকদিন ঐ স্থানে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন; কোনও কাজের ঠেকা না থাকিলে আমাকেও দুই চার দিন সেখানে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কন্যাও পিতার সহিত সেই অনুরোধে যোগ দিল এবং আমি যখন তাঁহাদের অনুরোধে সম্মতি জানাইলাম, তখন তাঁহারা খুবই আনন্দিত হইলেন। আমিও কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত হইব না ভাবিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলাম। তারপর সোন নদীর তীরে কত মধুর সন্ধ্যা তাহার সহিত অতিবাহিত করিয়াছি, সেই দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মৌন সাধনার মাঝে কত আমোদ গল্পে কত সাহিত্যচর্চ্চায় কত পুলকময় সন্ধ্যার আলোকে দুইটি হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল।

(২)

"আজও মনে পড়ে সেই বিচ্ছেদ কাতর আঁখি দুটি যাহা আমার এলাহাবাদে বিদায়কালে গৃহদ্বারে পথ চাহিয়া সন্ধ্যাতারার মত ফুটিয়াছিল। যদিও অল্পদিনের জন্য আমাদের এ বিচ্ছেদ, কারণ তাঁহাদের ও শীঘ্রই এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবার কথা, তথাপি চন্দ্রার কাতর মুখখানি আমার মনে এমনি আঁকিয়া গিয়াছিল যে প্রকৃতই পথে আমার কান্না আসিতেছিল। বলিতে ভুলিয়াছি মেয়েটির নাম চন্দ্রাবাই।

কিন্তু ভগবান্ যার কপালে দুঃখ লিখিয়াছেন তার সুখের আশা মিটিবে কেন? এলাহাবাদে আসিয়া শুনিলাম আমার আত্মীয়টি সেখান হইতে কোথায় বদলি হইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক যখন আসিয়া পড়িয়াছি তখন না দেখিয়া আর ফিরিব না স্থির করিলাম। একেবারে কৃষ্ণা হোটেলে গিয়া উঠিলাম। কৃষ্ণা হোটেলটি মোটের উপর মন্দ নয়, আহার শয়নের ব্যবস্থা ভালই। এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদতুল্য নূতন প্রস্তর নির্ম্মিত সেনেট গৃহের অতি নিকটেই ইহা অবস্থিত। এলাহাবাদে পৌঁছিবার পরের দিন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহগুলি দেখিয়া আসিলাম। বেড়াইয়া ফিরিতেই শরীরটা বড় খারাপ লাগিতে লাগিল, মাথায় একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। না খাইয়া শুইয়া পড়িলাম, মধ্যরাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিলে বুঝিলাম খুব জ্বর হইয়াছে,

তারপর জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া রহিলাম। এইরূপ কদিন অচেতন অবস্থায় ছিলাম জানিনা। যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম আমার শয্যার সম্মুখস্থ টেবিলের বইগুলি বেশ গুছান রহিয়াছে, এই লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে যেন একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম চন্দ্রা একহাতে পথ্য ও আরেক হাতে এক গ্লাস জল লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। চন্দ্রাকে এখানে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমার অচেতন অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া চন্দ্রা বড় আহ্লাদিত হইল, তাহার মুখের প্রফুল্লভাব দেখিয়া আমি ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। তারপর সে আপনা হইতেই আমার শিয়রে বসিয়া একে একে সব কথা বলিতে আরম্ভ করিল ; আমার এত অধিক জ্বরে আমাকে এরূপ অচেতন অবস্থায় দেখিয়া কৃষ্ণাহোটেলের কর্ত্তৃপক্ষেরা আমার কোনও আত্মীয়ের ঠিকানা পাইবার জন্য আমার পকেট অনুসন্ধান করিয়া ওঙ্কারলাল চতুর্ব্বেদী মহাশয়ের ঠিকানা পাইয়া তাঁহাকেই তার করিয়াছিল এবং তিনি কন্যাকে লইয়া অচিরে কৃষ্ণা হোটেলে উপস্থিত হইয়া আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চন্দ্রা পিতাকে কোনও নার্স রাখিতে না দিয়া নিজেই সমস্ত শুশ্রূষার ভার লইয়াছে। এমন সময় চন্দ্রার পিতা আমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনিও আমাকে জ্ঞানাবস্থা ফিরিয়া পাইতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম চন্দ্রার দিবারাত্র শুশ্রূষার গুণেই আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। আমার তখন কথা বলিবার শক্তি

ছিল না, তাই চন্দ্রা ও তাহার পিতার দিকে করুণ নেত্রে তাকাইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। আমার চোখ হইতে দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

ক্রমে ক্রমে আমি আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলাম। বেশ একটু সারিয়া আসিলে চন্দ্রা আমাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া গেল। তাহাদের বাড়ী লুকারগঞ্জে এলাহাবাদ ষ্টেসনের নিকটে। লুকারগঞ্জ রোডটী বেশ প্রশস্ত, দুই ধারে বড় বড় বৃক্ষের শ্রেণী বহু শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া একটা স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

একদিন আমি চন্দ্রা ও তাহার ছোট এক মামাত ভাই আমরা কয়জনে মিলিয়া খস্রুবাগে বেড়াইতে গেলাম। খস্রুবাগ লুকারগঞ্জের খুব নিকটে। এখানে খস্রু ও তাঁহার বেগমের এবং আরও কয়টী সমাধি রহিয়াছে। সমাধির চারিধারে একটা সুন্দর পুষ্পোদ্যান। সেই উদ্যানের মধ্যে এখন সমস্ত সহরে—জল সরবরাহ করিবার জন্য প্রকাণ্ড কল রহিয়াছে। আমরা ঐ জলের কল দেখিয়া সমাধিস্থানগুলি দেখিতে লাগিলাম। কোন্ এক যুদ্ধে জাহাঙ্গীরতনয় খস্রু বিদ্রোহী হইয়া এখানে অন্তিম শয়নে শুইয়া আছে। আজ মনে পড়িয়া গেল মোগল বাদসাহের সেই লোকাতীত ঐশ্বর্য্য, তাহা এখন কোন্ মায়াপুরীব খেলার মত অতীতের দর্পণ তলে, এখন শুধু ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল এই রকম কয়েকটী স্মৃতি তাহা কালের সর্ব্ববিধ্বংসী ক্ষমতাকে উপহাস করিয়া এখনও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া

আছে। সাহাজাদা খস্রু ও তাঁহার বেগমের কবরের পাশে আর একটী কবর দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাহা খস্রুর এক প্রিয়পাত্রী পানওয়ালীর কবর, একমাত্র ভালবাসার দাবীতে পানওয়ালী ঐখানে স্থান পাইয়াছে। শুনিয়া ঐ কবরের উপর গিয়া বসিতে ইচ্ছা করিল, সঙ্গে সঙ্গে খস্রুর উপর একটু শ্রদ্ধাব ভাবই আসিল। এমনি আপনকরা ভালবাসা যা সামান্য পানওয়ালীকে একেবারে নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছে তাহার চরণে মাথা নোয়াইতেই হয়। এমন আপনাভোলা প্রাণ-নিঙড়ান ভালবাসা কয়টালোকের ভাগ্যে ঘটে কে জানে, তাই ইহার সম্মানের জন্য আমরা ঐ কবরের পাশে আসিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল; স্থানটী নির্জ্জন। এই নির্জ্জন পবিত্রস্থানে আমার বড় গান শুনিতে ইচ্ছা করিল। চন্দ্রাকে একটা গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম। সে কয়েকবার আপত্তি করিয়া পরে স্বীকৃতা হইল। চন্দ্রার স্বর বড় মধুর, সে সেই মধুর স্বরে করুণকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল—

"সাচী-প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি
তুম্ সঙ্গ যোড়ি আওর সঙ্গ তোড়ি।
যো তুম্ বাদল তো হাম মৌ'রা,
যো তুম্ চন্দ্র হাম ভায়জী চকোরা।
যো তুম্ দেওরা তো হাম্ বাতি,
যো তুম্ তীরথ তো হাম্ যাত্রী।

যাঁহা যাঁহি তাঁহা তেরি হি সেবা
তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা।”

এই গানটী ভগবানের চরণে ভক্তের আত্মনিবেদন। ভক্ত বলিতেছে, ওগো তুমি আমার ইন্দু, আমি তোমার জ্যোৎস্নাভিখারী চকোর। এই প্রেমের পুণ্যতীর্থে এই নির্জ্জন উদ্যানের মাঝে প্রকৃতির মৌন সহানুভূতির মধ্যে সেই গানেব রাগিণী আকাশে বাতাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অন্তরের মণিকোঠায় থাকিয়া থাকিয়া বাজিতেছিল—“তুম্ সা ঠাকুর আওর না দেবা।”

(৩)

“সেদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে চন্দ্রার কয়েকটী ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে লইয়া চন্দ্রা আর আমি প্রয়াগে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এলাহাবাদ কোর্টের নিকট একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া আমরা গিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ধীর সমীবণে শান্ত নদীর বুকের উপর দিয়া তর্‌তর্ বেগে নৌকাখানি চলিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার অস্তমান রবির কিরণ যমুনার কালো জলে পড়িয়া একটা কোমল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ক্রমে গঙ্গাযমুনার সঙ্গলস্থলে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে যমুনার স্বচ্ছ নির্ম্মল কালো জল গঙ্গার শুভ্র অঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। শরতের নির্ম্মেঘ আকাশের তরল জ্যোৎস্না গঙ্গার বুকে চিক চিক করিতেছে। মনে হইতেছিল যেন একটী গৌরবর্ণা তন্বী গুছাইয়া একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পরিয়াছে। এই যমুনার সাথে কত গাথা, কত গীতিকাব্য, কত

বাঁশরীর রাগিণী মিশাইয়া রহিয়াছে। সন্ধ্যার সেই পরাণ পাগল-করা উদাস ভাবের মাঝে মনে হইতেছিল যেন কোন্ অদূর কুঞ্জভূমি হইতে শ্যামসুন্দরের গোপীমন-ভুলান বাঁশরীর ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। চন্দ্রা সাথে করিয়া একটি সেতার লইয়া আসিয়াছিল ভাবমুগ্ধা হইয়া সে কখন উহার কাণ মোচড়াইয়া পর্দ্দায় অঙ্গুলি সংযোগ করিয়া একটা মধুর ঝঙ্কার দিল। সুর প্রথমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইলেও ক্রমে তাহা নব বধূর ঘোমটা ঢাকা মুখের মত সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। সুরের শান্ত কোমল উচ্ছ্বাস তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছিল। আমি ভাবের আবেগে সেই সুরের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে লাগিলাম—

"অয়ি ভুবন মনোমোহিনি!
নির্ম্মল সূর্য্যাকরোজ্জ্বল ধরণী-জনক-জননী।
প্রথম প্রভাত তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।"

রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া চন্দ্রা গানটী শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার চক্ষু জলভরাক্রান্ত হইয়া আসিল, দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আমি আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে গাহিয়া চলিলাম—

"নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণ তল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,

অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী।” •

গান থামিয়া গেল। অনেকক্ষণ সকলে নীরব হইয়া রহিল, তারপর চন্দ্রা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল—“কি সুন্দর কথাগুলি”! আমি বলিলাম, এই সঙ্গীতটী আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা। পদলালিত্যে ও ভাবমাধুর্য্যে এই গানটী বাঙ্গলা ভাষার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। এই যে আমাদের দেশ জননীর পবিত্রশ্রীর পরিচয় যার স্মৃতি মাত্রেই আমাদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব গর্ব্বের ভাব জাগিয়া উঠে, আমরা কি তাহা ধারণ করিবার উপযুক্ত হইব না? কোন্ অপূর্ব্ব উষায় এই ভারতের তপোবনে সামঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছিল; কত জ্ঞানের বার্ত্তা ধর্ম্মের কথা এই আর্য্য ঋষিগণের আবাসভূমি হইতে প্রচারিত হইয়াছিল; নূতন সভ্যতার দীপ্তিতে প্রভাসিত কত কাব্য দর্শন পৌরাণিক কাহিনী এই তুষারমৌলিহিমাচলরক্ষিত শতপুণ্যনদনদীবিধৌত আর্য্যভূমি হইতে বিঘোষিত হইয়াছিল। আমরা সেই ভারতে জন্মিয়া সকল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, পরের কথায় বিমুগ্ধ, নিজের নিজস্ব বুঝিবার চেষ্টা করি না, আত্মপ্রতিষ্ঠায় আমাদের যত্ন নাই। এইরূপ দেশের অনেক কথা চন্দ্রার সাথে আমার সেদিন হইয়াছিল। রাত্রি হইয়া আসিল, আমরা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

(৪)

"পরদিন দেশ হইতে সংবাদ আসিল আমার মায়ের বড় অসুখ, শীঘ্রই আমার যাওয়া প্রয়োজন। সে দিনই চন্দ্রাপ্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। আজও মনে পড়ে চন্দ্রার সেই বিচ্ছেদকাতর মুখখানি যাহা আমার অন্তরের মাঝে মূর্ত্তি লইয়া এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। দেশে আসিয়া দেখিলাম মায়ের আমার বড়ই অসুখ। প্রাণপণ যত্ন করিয়া যথাসাধ্য অর্থব্যয়ে মায়ের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চালাইতে লাগিলাম। প্রায় দশমাস ভূগিয়া আমার মায়া কাটাইয়া মা আমার স্বর্গে গমন করিলেন। মৃত্যু শয্যায় আমার মাথায় হাত রাখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"বাবা জীবনে চিরসুখী হও।" ভগবান্ অন্তরালে থাকিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"হুঁ"।

প্রায় একবৎসর উদাস ভাবে তীর্থে তীর্থে কাটাইয়া মনটা একটু শান্ত হইলে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিন মনের অশান্তি ও উৎকণ্ঠায় চন্দ্রার কথা বড় মনে আসে নাই, কিন্তু আজ বাড়ী আসিয়া শুধু চন্দ্রার কথাই মনে হইতে লাগিল। কয়েকদিন এইরূপভাবে মনমরা থাকিয়া এলাহাবাদে যাইব ভাবিতেছি এমন সময় আমার নামে একখানি পত্র আসিল। ডাক ঘরের ছাপ দেখিয়া বুঝিলাম চিঠিখানি এলাহাবাদ হইতে আসিতেছে। বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিলাম। সংবাদ পড়িয়া মাথা ঘুরিয়া গেল, হাত হইতে

চিঠিটা পড়িয়া গেলাম। এলাহাবাদ হইতে চন্দ্রার মামাত বোন লিখিয়াছে "সুশীল বাবু, আমাদের প্রিয় ভগিনী চন্দ্রা আজ চারিদিন হইল আমাদের সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় ছয়মাস কাল তিনি ক্ষয় রোগে ভুগিতে ছিলেন, মৃত্যুর একসপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আপানার নামে একখানি পত্র লিখিয়া গিয়াছেন। আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন মৃত্যুর পরে ইহা আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতে। সেই কথা অনুসারে পত্রখানি আপনার কাছে পাঠাইলাম।" স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে চন্দ্রার পত্রখানি তুলিয়া লইলাম। চন্দ্রা লিখিয়াছে—

"ওগো বন্ধু আমার,

মনে হয় আজ কত যুগ বুঝি কেটে গেছে আমাদের সেই—চিরমধুর মিলনের পরে। না, তর্ক করোনা, জানি তোমার তর্ক করবার একটা রোগ আছে। তুমি বোধ হয় বুঝবে না সত্যি সত্যি একটা যেন যুগ কেটে গেছে। যাকে সামনে পেলে নিমেষে হারাই এমনতর ভয় সব সময়ে জেগে থাকৃত তাকে এতদিন না দেখে কেমন করে বেঁচে আছি আমিই বুঝতে পারিনি। মনে পড়ে কি তোমার কাছেই বিদ্যাপতির একটা পদ শুনেছিলাম, সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,

লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।”

আজ বুঝতে পারছি এ মস্ত একটা সত্যি কথা। হেসোনা, মনে ভাবছ চন্দ্রা কেমন করে এতবড় দার্শনিক হয়ে পড়ল। দার্শনিক কি লোকে কেবল বই পড়েই হবে, মনের মাঝখানে কতভাব কত নূতন রূপ নিয়ে ফুটে উঠ্‌ছে। সেই সব রূপকে চিন্‌তে গেলেই ত মানুষ দার্শনিক হয়ে পড়ে। এতদিনের জমাট বাঁধা ব্যাথা আজ আমায় এমন মুখরা করে দিয়েছে। তুমি ভাবছ এতদিন তবে কেমন করে তোমায় ভুলেছিলাম। বন্ধু ভুলতে তোমায় কখন পারিনি, পারতেও চাইনি। কতদিন তোমায় চিঠি লিখতে বসেছি কিন্তু দুই ছত্র লিখেই লজ্জায় আর লিখ্‌তে পারি নি। দুছত্র লেখা চিঠিখানা অমনি ছিঁড়ে ফেলেছি। আজ আমার কিন্তু লজ্জার সকল বাঁধন টুটে গিয়েছে। জানি আমি আমার দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে আর তুমি যখন আমার এচিঠি পাবে তখন আমি অন্য লোকে। লজ্জায় আর আমায় মৌন রাখতে পারবে না কারণ আজ আমি তোমার কাছে আমার প্রাণের কথা উজাড় করে দিয়ে যাব।

মনে পড়ে তোমার সেই ডিরি অনসনে থাকার কথা? তোমার সুন্দর সরল তেজস্বী কথাগুলি শুনতে শুনতে আমি তোমার মুখের পানে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকতাম। কি দীপ্ত সে মুখ কি স্বর্গীয় লাবণ্য সে মুখে খেলা করত। তুমি স্বভাবতঃ বড় বেশী

কথা বল্‌তে না কিন্তু তোমার কথাগুলি শুন্‌তে আমার এমন ইচ্ছা হ'ত যে কোন বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে তোমার অনর্গল তর্কের ঝরণায় ডুবে থাক্‌তাম। তুমি বুঝি ভাব্‌তে আমি তোমার কথাগুলি সব গিলে নিচ্চি তোমার ভক্ত শিষ্য হব বলে। তোমার কথাগুলি গিলতাম নিশ্চয় কিন্তু সে যেমন দেবতারা সাগর মন্থনের পর অসুরের ভয়ে সুধা গিলেছিল। ভয় হত পাছে একটা কথাও হারিয়ে ফেলি। তারপর যেদিন তুমি ডিরি অন্‌সোন থেকে এলাহাবাদে চলে গেলে তখন আমার বুক ভেঙ্গে যেন কান্না বেরচ্ছিল। জানতাম আমরাও শীঘ্রই এলাহাবাদে যাচ্ছি, তবু বিচ্ছেদটা আমার প্রাণে এমনি ভাবে বেজেছিল।

তারপর কৃষ্ণা হোটেলের ম্যানেজার যেদিন বাবার কাছে তার করলে আর আমরা তোমার ওখানে গিয়ে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখলাম, সে দিন আমার মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাগল আমি তোমায় সারিয়ে তুলবই। বন্ধু, আজ আমার কোনও সঙ্কোচ নেই, তাই তোমায় সব কথাই বল্‌তে পার্‌চি। তোমার অসুখের মধ্যে তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখে চিকিৎসকের আশা পেয়ে বা নিরাশ ভাব দেখে কখনও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তাম কখনও বা অবসাদে হৃদয় ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু ভগবানের নাম নিয়ে দিনরাত্রি বুক বেঁধে শুশ্রূষা করেছিলাম। ওঃ সে দিন তোমার জ্ঞান ফিরে আসতে দেখে আমার কি আনন্দই হয়েছিল।

সে দিন শরতের আকাশে জ্যোৎস্নার বাণ ডেকেছিল। খোলা জানালা দিয়ে তোমার মুখের উপর আলোর ধারা খেলা করছিল। আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। তখন মহেন্দ্রযোগ না ঐ রকম একটা শুভলগ্ন, তুমি অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছিলে। আমি আমার আংটিটা খুলে তোমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলাম, তোমার আংটিটা খুলে নিয়ে নিজের আঙ্গুলে পরে নিলাম। তারপর তোমার পায়ের কাছে ঢিপ করে একটা নমস্কার করে ফেললাম। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে বল্‌লাম এই আমাদের বিয়ে হয়ে গেল! তুমি হাস্‌ছ। কিন্তু জেনো ভগবান যেখানে পুরোহিত এবং আকাশের তারা যেখানে সাক্ষী তার চেয়ে খাঁটি বিয়ে আর হতে পারে না। প্রকৃত বিয়ে ত অন্তরে অন্তরে মিলন, জাত সম্বন্ধ বিচার করলে তার গৌরবটাকেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। মন্ত্রপড়া ত একটা লৌকিক আচার মাত্র। যখন মনে মনে বিয়ে হয়ে গেল তখন কোন মন্ত্রটা পড়া হল কি না হল তা ভাববারই ত সময় থাকে না। প্রকৃতির মাঝেও ঠিক এমনি প্রেমের লীলা, দেখনি মাধবীলতা যখন সহকারতরুকে ঘিরে ঘিরে পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে গড়ে উঠে, তখন সে ভেবে দেখে না তার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ কোনও লৌকিক নিয়মসিদ্ধ বা মন্ত্রানুমোদিত কি না।

তারপর তুমি তোমার মায়ের অসুখ শুনে চলে গেলে। পাছে তোমার যাত্রায় অশুভ হয় এই জন্য প্রাণপণে তোমার নিকট প্রফুল্লভাব দেখিয়ে এসেছি। কিন্তু যেমন বেশী আঘাত লাগলে

একটা নীল কালশিরে দাগ হয়ে থাকে, রক্তের লেশও পড়ে না, তেমনি এই আমার জমাটবাঁধা বেদনা এমনি পুঞ্জীভূত হয়েছিল, যে তাতে বোধ হয় অশ্রুর উৎসের মুখে একটা পাথর চাপা পড়েছিল। তোমার কি মনে পড়ে তোমার একখানি ফটো এলাহাবাদে চুরি গিয়েছিল। সে চোর আমিই। তোমার চলে আসার পর সেই ফটোখানি রোজ গোলাপ ফুলে সাজিয়ে রাখ্‌তুম কারণ জান্‌তাম তুমি গোলাপ ফুলই বেশী ভালবাস্‌তে। এখনো এই যে আমি তোমার কাছে চিঠিখানি লিখ্‌ছি তাতেও আমার সামনে তোমার ফটোখানি যেন একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধু, আর আমি কি বল্‌ব, আমার কথা শেষ হয়ে এসেছে। বন্ধু চল্‌লাম্‌, বিবাহ ত আমাদের হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষায় রইলাম, জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার অপেক্ষায় থাক্‌ব। সাধনায় সিদ্ধি হবেই তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পাব এই আশা দিয়ে বুক বেঁধে থাক্‌ব। বন্ধু চল্‌লাম মিলনের পথ চেয়ে বসে থাক্‌ব। বিদায়, বন্ধু, বিদায়। চন্দ্রা।"

এইখানে সুশীলচন্দ্র তাহার জীবনের আখ্যায়িকা শেষ করিয়া বলিলেন—"ওগো, আজ তোমরা আমার জীবনের কথা শুন্‌লে। জীবনে আমার সুখের উৎস—শুখিয়ে গিয়েছে। যার সাথে আমার এমনি পবিত্র মিলন হয়েছে তার সাথে আবার কবে মিল্‌ব তাই বসে বসে ভাবি। সেই মিলনেই হবে আমাদের ফুলশয্যা।" এই বলিয়া সুশীলচন্দ্র নীরব হইলেন। তখন রাত্রি অনেকটা কাটিয়া

গিয়াছে। চিন্তান্বিত মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। পথে কে যেন তখন গাহিয়া যাইতেছিল—

"মন-বুলবুলে তুলেছে রাগিণী
হৃদয় আমার মথিছে ধীরে ;
গত জীবনের কত ভালবাসা
অবুঝ মানসে বিহরি ফিরে।"

নরকের দ্বার

(১)

রুদ্রকুমার ছিল দর্শনশাস্ত্রে এম-এ ; হিন্দুদর্শনে বিশেষজ্ঞ। কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি য়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যেরই সে ছিল অধিক গোঁড়া। ভগবান্ শঙ্করের কথা তার নিকট বেদবাক্য অপেক্ষাও ছিল অভ্রান্ত। বুঝিয়া হউক, অথবা না বুঝিয়াই হউক, তাঁর সবগুলি যুক্তি অবাধে মানিয়া লওয়াই ছিল রুদ্রকুমারের বিদ্যাবত্তার পরিচয়। মোট কথা, কথায় কথায় বিবেক বুদ্ধি না খাটাইয়াই সে শঙ্করের দোহাই দিতে থাকিত। শঙ্করাচার্য্য নাকি বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক নরকের দ্বার, তাহার ছায়া মাড়াইলেও নাকি মস্ত পাপ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন হয়। তাই রুদ্রকুমার পারতপক্ষে স্ত্রীলোকের নাম করিত না, কোনও কথায় স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইলে বলিত, অমুক নরকের দ্বার। এই নরকের দ্বারের হাত হইতে উদ্ধারও পাইয়াছিল সে যথেষ্ট! একমাত্র বৃদ্ধা মা ছাড়া তার সংসারে ধারে কাছে কোনও স্ত্রীলোকই ছিল না, এবং ইহা বলাই বাহুল্য

যে, তার মত শঙ্করের চেলা বিবাহ করিয়া নরকের দ্বার দিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইবে এমন স্বপ্ন তার অতিবড় শত্রুও দেখিতে পারিত কি না সন্দেহ। আরও বিশেষত্ব এই, তার পিতৃ-মাতৃদত্ত নাম ছিল রমণীমোহন, অবশ্য চেহারাখানাও বেশ সুন্দরই ছিল, নামটা মোটেই বেমানান হয় নাই। তবে নামটা যেন নরকের গন্ধে ভরপুর,—সেই নরকের দ্বার রমণী, তারই আবার মোহন। একথা মনে হইতেই রুদ্রকুমারের প্রাণটা শিহরিয়া উঠিত; এত বড় শঙ্করপন্থ র কি না এমন বিপরীত নাম। ভাবিয়া চিন্তিয়া ঐ নামটা বদলাইয়া সে নূতন নাম রাখিল রুদ্রকুমার! নিজের নাম আর কেহ নিজে রাখিয়াছে কি না তাহা জানা যায় নাই, তবে রমণীমোহন বদলাইয়া যে রুদ্রকুমারে পরিণত হইয়াছিল ইহার প্রমাণ আছে। ইউনিভার্সিটির calender এ নাম বদলাইবার জন্য রেজিষ্ট্রারের কাছে তার চিঠিপত্র খুবই লিখিতে হইয়াছিল তবে শেষে তারই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। এখন সে রুদ্রকুমার নামেই পরিচিত, কলিকাতার একটি মাঝারি রকম কলেজের অধ্যাপক, মাহিনা একশত টাকা। এত নাম থাকিতে কেন যে রুদ্রকুমার নাম বাছা হইল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, 'ওহে জানই ত রুদ্রকুমার কার্ত্তিকের এক নাম, তা দেবতাদের মধ্যেও কার্ত্তিকের মত এমন শক্তিমান তেজস্বী পুরুষ কে ছিলেন। তিনিই ত দেবসেনাপতি, তাতে আবার আদর্শ ব্রহ্মচারী অবিবাহিত। ওসব নরকের দ্বার-টারের ছায়া মাড়ান নি।

অবশ্য বাঙ্গালা দেশের দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে কার্ত্তিকের ফুলবাবুটির মত চেহারা দেখলে, তোমরা ওসব বুঝবে না। বুঝলে না, ওসব হল তোমাদের বাঙ্গালা দেশের বানানো কার্ত্তিকের রূপ। কুমারসম্ভব পড়ে দেখ, তখন বুঝবে আসলে কার্ত্তিক কেমন দেবতা। তোমাদের কি, যেমন নিজেরা, দেবতাকেও গড় তেমন।”

এহেন রুদ্রকুমার থাকিতেন কলিকাতার একটি মেসে—একলা একটি ঘর নিয়ে। এমন অদ্ভুত চরিত্রের লোকের সঙ্গে যে মেসের অধিকাংশ লোকের বনিবনা হইত না এটা বলাই বাহুল্য। তবে রুদ্রকুমারের মনটা ছিল খুবই সরল এবং মেসের লোকদের অভাব কষ্টে তার সহানুভূতির বেশ পরিচয় পাওয়া যাইত। অর্থসাহায্য করিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না। সুতরাং অনেকে তার অদ্ভুত চরিত্র লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিলেও তাহাকে আন্তরিক ভালবাসিত। বন্ধু মোহিনীমোহন ছিল সেই দলের, বেজায় রসিক পুরুষ, খুব খোসমেজাজী লোকটি, গানের ঝঙ্কার কণ্ঠে লাগিয়াই আছে, আর কথায় কথায় ঠাট্টা করিয়া রুদ্রকুমারকে অস্থির করিয়া তুলিত। কিন্তু সে রুদ্রকুমারকে ভালবাসিতও যথেষ্ট। রুদ্রকুমারও তাহাকেই বেশী পছন্দ করিত এবং সেইজন্যই তাহাকে বেশী ডাকিতে হইত বলিয়া মোহিনীমোহন নামটা বদলাইয়া সে তাহাকে করিয়া লইয়াছিল মুরারিচরণ; কারণ মোহিনী নামটায়ও যে বদগন্ধ—সেই ‘নরকের দ্বার’ দেখা যাইতেছে। এই নাম বদলান প্রসঙ্গে একদিন রুদ্রকুমার মুরারিকে—এখন হইতে আমরা মোহিনী-

মোহনকে এই নামেই অভিহিত করিব—বলিয়াছিল—'দেখ মুরারি, বাঙ্গালা দেশে কি বিশ্রী নাম রাখবার ধরণ দেখ ত, এতে পুরুষগুলা মেয়েলি হবে না ত কি হবে? তারা যে ঐ 'নরকের দ্বার'গুলার মত সিঁতি কাটে, অঙ্গভঙ্গী করে, গান গায়, তাঁর কারণ ঐ নাম রাখা। কেন বাপু, ভাল নাম কি মনে পড়ে না—এই ত ধর না বারেন্দ্রবিনোদ, সংগ্রামচন্দ্র, সমরলাল, আশুতোষ, অরবিন্দ, বারীন্দ্র-কুমার, এসব নাম থাকতে কি যে ছাই নাম রাখা। বলিহারী যা হ'ক।'

মুরারি কিন্তু বিবাহিত; সেইজন্য রুদ্রকুমার তাহাকে 'নরকের দ্বারের' খোঁটা দিতে ছাড়িত না। একদিন মুরারি দেশ হইতে স্ত্রীর একখানি বিশেষ প্রেমসম্ভাষণপূর্ণ পত্র পাইয়া খুব আনন্দের ঝোঁকে রুদ্রকুমারকে দুই একটা বেফাস কথা বলিয়া ফেলায় রুদ্রকুমার তাহাকে গম্ভীর ভাবে অবিবাহিত জীবনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে উপক্রম করিলে, সে নিজের হারমনিয়ামটি কোলের কাছে টানিয়া লইয়াই আরম্ভ করিল—

সে আসে ধেয়ে, এন্ ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে।

রুদ্রকুমার চেঁচাইয়া উঠিল—মুরারি কি ছাই যে আরম্ভ করলে, থাম হে থাম। কিন্তু মুরারিচরণের ভ্রুক্ষেপ নাই, সে ফূর্ত্তির জোরে গাহিয়া চলিল—

কুঞ্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,

খট্ মট্ বুট শোভিত পদ শব্দিত ম্যাটিনে এ।

রুদ্রকুমার ধমকাইয়া উঠিল,—'মুরারি! আমার সামনেও ফাজলামি।' কিন্তু শোনে কে, গান পুরাদমেই চলিল—

বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে ;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রয়িং-রুমট ছেয়ে।

রুদ্রকুমার আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে রাগিয়া উঠিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মুরারি তাহার পলায়মান মূর্ত্তির দিকে চঞ্চল চাহনি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'আচ্ছা, এর মজা দেখাব। এই 'নরকের দ্বারেব' দ্বারস্থ করে তোমায় ছাড়াব।' অলক্ষ্যে বিধাতা পুরুষ মুচকিয়া হাসিয়া বলিল 'হুঁ'।'

(২)

মাসিক একশত টাকায় রুদ্রকুমারের তেমন সংকুলান হইত না। অবশ্য তাহার সাধারণ চালচলন অতি অল্প ব্যয়েই কুলাইয়া যাইত। কিন্তু দেশে তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভালই ছিল এবং এক্ষণে অবস্থা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে ও সেইরূপ পূর্ব্বের চাল বজায় রাখিতে যাওয়ায় তাহার একটু বেশী ব্যয় হইয়া পড়িত। দেশে ছিল তাহার বৃদ্ধা মাতা ও এক কনিষ্ঠ সহোদর। সুতরাং রুদ্রকুমার তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিল সন্ধানে প্রাইভেট টিউসিনি আসিলে তাহাকে

খবর দিতে। একদিন মুরারিচরণ আসিয়া বলিল —'ওহে রুদ্রকুমার, একটা টিউসিনির সন্ধান পেয়েছি, করবে ত বল। শরৎবাঁড়ুয্যে পাটের আফিসের বড়বাবু, দুটি মাত্র ছেলে নিয়ে থাকেন। পত্নী সম্প্রতি মারা গেছেন, কোন রকম 'নরকের দ্বার'টারের গন্ধ টন্ধ নেই। ছেলে দুটির মধ্যে একটি ফোর্থ ক্লাসে আর একটি ফিপ্থ ক্লাসে পড়ে। একবেলা পড়াতে হবে, মাইনে দেবে ৩০৲ টাকা, রাজি থাক ত বল।' রুদ্রকুমার দেখিল মন্দ নয়, তার এই ৩০৲ টাকার সম্প্রতি বিশেষ প্রয়োজন। আর অসুবিধাও কিছু নাই, বিকালে স্কুলের পর না হয় ঘণ্টা দুয়েক পড়াইয়া আসিবে। যাক্, তার উপর আবার 'নরকের দ্বার'টারের বালাই নাই। রুদ্রকুমার রাজি হইল, পরদিন মুরারির সহিত শরৎবাবুর বাড়ী গিয়া পড়াইবার ভার লইল। রুদ্রকুমারের পড়ান ব্যাপার মন্দ কাটিতেছিল না; ছেলে দুটি মেধাবী ও মনোযোগী এবং মাষ্টার মহাশয়ের বেশ বাধ্যও হইল।

সেবার পূজার ছুটিতে মেসের সকলে বাড়ী চলিয়া গেল। রুদ্রকুমার কেবল তখনও বিশেষ কাজের ঠেকায় মেসের মায়া কাটাইতে পারিতেছিল না। একটা সরকারী কলেজের অধ্যাপকের পদ খালি হইয়াছে। রুদ্রকুমার সেখানে দরখাস্ত দিয়া সুপারিসের জন্য বড় বড় লোকের বাটী হাটাহাটি করিতেছে। ইচ্ছা যে, ছুটী ফুরাইলেই সেই সব সুপারিস পত্র লইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তার সহিত দেখা করিবে। হঠাৎ একদিন রুদ্রকুমারের নামে তারের

খবর আসিল, তার মা অতিশয় পীড়িতা, অনতিবিলম্বে ডাক্তার লইয়া যাইতে হইবে। রুদ্রকুমারের দেশ হুগলি জেলায়। তখন তাহার মোটেই টাকার সংস্থান নাই। শরৎবাবুর নিকট হইতে কিছু টাকা আপাততঃ লইয়া সে সন্ধ্যার ট্রেণে একেবারে ডাক্তারের সঙ্গে হুগলি যাইবে ঠিক করিল। সে জুতা জামা পরিয়া ছাত্রগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, তাহার ছাত্র দুইটী পিতার সহিত কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে, বাড়ীতে এক নূতন ঝি আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, কর্ত্তা ছেলেদের লইয়া বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন। এই ঝিকে রুদ্রকুমার পূর্ব্বে দেখে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কর্ত্তার এক শ্যালিকা কন্যা আজ এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে, কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া পূজার পর পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবে, নূতন ঝি তাহার সঙ্গেই আসিয়াছে। রুদ্রকুমার হতাশভরে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার যে টাকার বড়ই প্রয়োজন, তার মা যে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে যাইতে বসিয়াছেন। রুদ্র-কুমারের অকস্মাৎ এই ভাবান্তর দেখিয়া ঝি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। 'বাপু, তোমার কি অসুখ করেছে, মুখ অমন শুখনো দেখাচ্ছে কেন?' ঝিএর এই করুণ জিজ্ঞাসাও রুদ্রকুমারের মনে একটু সান্ত্বনা আনিয়া দিল, তাহার মুখ দিয়া অলক্ষিতে বাহির হইল - 'কি করি, মায়ের চিকিৎসার জন্য টাকার যে এখনি বড় প্রয়োজন, এই সাতটার গাড়ীতেই যে আমাকে ডাক্তার লইয়া

হুগলি যাইতে হইবে।' তাহার এই কথাকয়টী শুনিয়া ঝি অন্দরে গিয়া দিদিমণিকে সব কথা বলিল। শুনিয়া দিদিমণি কয়েকটী কথা চুপি চুপি বলিয়া ঝিকে রুদ্রকুমারের কাছে পাঠাইয়া দিল। ঝি আসিয়া বলিল, 'দেখ বাপু, আমাদের দিদিমণি বললে, তোমার মায়ের যখন এমন ব্যারাম, আর তোমার হাতে যখন ডাক্তারকে দেবার মত টাকা নেই, তখন আমাদের দিদিমণি বললে তার কাছে হাত খরচের জন্য ২৫৲ টাকা আছে, তোমায় দিচ্ছে, তুমি নিয়ে যাও বাপু, এই নাও টাকা। কতক্ষণ অপেক্ষা করবে, তোমার এখনই যাওয়া উচিত। নানা, ওটা নিতে লজ্জা করা কেন? বাবু বাড়ী এলেই ত দিদিমণি ও টাকা নিতে পারবে।' রুদ্রকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া দুই একটা অলক্ষ্যে ধন্যবাদ দিয়া একান্ত প্রয়োজনহেতু টাকা কটা লইয়া বাহিরে আসিল।

রুদ্রকুমারের মনে একটা ধাক্কা লাগিল: সে আজ একজন 'নরকের দ্বারে'র নিকটই মায়ের জীবনের জন্য বোধ হয় ঋণী হইল। তাহার মনের এক কোণে একবার ধ্বনিত হইল—না, স্ত্রীলোকেরা বড় করুণাময়ী। তখন তাহার মধ্যে যেটুকু শঙ্করের চেলা সে বলিয়া উঠিল, কি আর এমন, মেসোর থেকে ত এখনি টাকটা ফিরে পাবে। আবার তাহার ভিতর কে উঁচু হইয়া বলিল—তা হ'ক গে, তবুও কোন্ অপরিচিতার তার জন্য মাথাব্যথা পড়েছিল যে, ঝিকে দিয়ে সেধে টাকা পাঠিয়ে দেবে। এইরূপে সমস্ত রাস্তাটা মনে মনে এ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সে ডাক্তারকে লইয়া শিয়ালদা

ষ্টেশন থেকে ট্রেণে রওনা দিল। নৈহাটী আসিয়া নৌকা ঠিক করিয়া সে ডাক্তারের সঙ্গে চড়িয়া বসিল। ঢেউয়ের মাঝে হেলিতে দুলিতে জ্যোৎস্নার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে নৌকাখানি বহিয়া চলিল। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হিল্লোলের উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রকুমারের মনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এক করুণতা-মাখা হাস্যোজ্জ্বল অপরিচিতার মুখ। অমনি তাহার মধ্যে শঙ্করের চেলাটি চোখ রাঙ্গাইয়া মনকে বলিতে থাকে—ছিঃ। ক্রমে সে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল, ডাক্তারকে দিয়া মায়ের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া লইল। তারপর প্রাণান্ত সেবা-শুশ্রূষা করিয়া সে একপ্রকার যমের হাত হইতে মাকে ফিরাইয়া আনিল। এ কয়দিন আর সে চিন্তা করিবার বা অপরিচিতা উপকারিণী সম্বন্ধে ভাবিবার অবকাশ পায় নাই। মায়ের আরোগ্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে সে সেই পূর্ব্বের চিন্তা লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

(৩)

পূজার ছুটি ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। মেসের লোকেরা ফিরিয়া আসিতে লাগিল, রুদ্রকুমারও ফিরিল। কিন্তু একটু যেন তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মাঝে মাঝে তাহাকে চিন্তাযুক্ত দেখা যায়। কথা বলিবার সময়ও যেন কখনও কখনও ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। সেই অপরিচিতা উপকারিণীর কথা মাঝে মাঝে তাহার মন

অধিকার করিয়া বসে। যাহা হউক, রুদ্রকুমার মনটাকে অনেকটা স্থির করিয়া আবার পড়াইতে গেল। প্রথম দিন শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি রুদ্রকুমারের মাতার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—'সেদিন বায়স্কোপ থেকে এসে মাধুরীর কাছে আপনার মায়ের পীড়ার অবস্থা শুনে বড়ই দুঃখিত হ'য়েছিলাম। আপনার টাকার অভাব আমায় আগে জানাননি কেন? ভাগ্যে সেদিন বুদ্ধি করে মাধুরী আপনাকে টাকা কটা দিয়ে দিয়েছিল। মাধুরী আমাদের বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে, যেমন রূপ, তেমন গুণ।' রুদ্রকুমার বুঝিল, শরৎ বাবুর শ্যালিকা-কন্যার নাম মাধুরী। এতদিন কিন্তু সে এরূপ নাম কত শুনিয়াছে, 'নরকের দ্বার' হিসাবে উহা অগ্রাহ্যই ছিল। এখন এ নামটা কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা কল্পনার ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গেল। এর চেয়ে অধিক শঙ্করের চেলার তখনও কিছু করিতে পারে নাই।

মাধুরী কিন্তু এখনও বাপের বাড়ী ফিরিয়া যায় নাই। কয়দিন পরে নাকি তার বাবা মা সকলেই শরৎবাবুর বাড়ীতে আসিবেন। তাঁহাদের সঙ্গেই মাধুরী ফিরিয়া যাইবে। রুদ্রকুমার এত সংবাদ জানিত না। তাহার চাঞ্চল্য এতদিনে অনেকটা দূর হইয়া আসিয়াছে। শঙ্করের ভক্ত কি না, 'নরকের দ্বারে'র প্রভাব কতদিন থাকিবে? একদিন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাহার পড়াইতে যাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ীতে কাহারা যেন অতিথি আসিয়াছে বোধ হইল। শরৎবাবুর গৃহে প্রবেশ করিতেই সে শুনিতে পাইল, উপরে দ্বিতলে মহিলাকণ্ঠে গীত হইতেছে—

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস !
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আস !

তখন সুরের ঢেউ খেলাইয়া গান চলিতেছে—

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জেলে বেড়াও কে জানে !

সুরের পর সুর খেলাইয়া গান থামিয়া গেল। কিন্তু তাহার ঝঙ্কার যেন তখনও সারা বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্য কয়েকটী খেয়ালের সঙ্গে রুদ্রকুমার সঙ্গীতের উপর ছিল বিশেষ বিরক্ত। কিন্তু আজ তাহার হৃদয়ের তারে এ কি অননুভূত মৃদু আঘাত! সেই অপ্সরা কণ্ঠের বীণানিন্দিত ঝঙ্কারে রুদ্রকুমার কতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া রহিল। কখন যে তাহার ছাত্রেরা মুরারি বাবুর সঙ্গে সেইখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহা তাহার লক্ষ্যই হয় নাই। সে ভাবিতেছিল, আহা এ কি সেই মাধুরীর কণ্ঠস্বর, সে কি তবে এখনও যায় নাই, আহা, কি প্রাণ-মাতান গীতধ্বনি! এই চিন্তা তার মনে আসিতেই একটা ছোট রকম দীর্ঘনিশ্বাস আপনা হইতেই বাহির হইল। অবশ্য ইহার অধিক তাহার সম্বন্ধে বলিলে তাহার শঙ্করভক্তির উপর দোষারোপ করা হয়। তখন স্থির হইয়া ফিরিতেই ছাত্র দুইটিকে এবং মুরারিকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মুরারি মৃদু হাসিয়া তাহার দিকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল

জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে রুদ্রকুমার, শরীরটা খারাপ বুঝি ? তা থাক্ না আজকে পড়ান ; শরীরের অসুখ বিসুখ হলে করা কি।' রুদ্রকুমার একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, 'না হে, তেমন কিছু না' বলিয়াই সে পড়াইতে আরম্ভ করিল, মুরারিও ~স্থান করিল।

রুদ্রকুমারের অবস্থার কিন্তু আবার আর একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সেই গান শুনার পর হইতে সে 'নরকের দ্বার' সম্বন্ধে কোনও স্থলে কিছু আলোচনা হইলে যোগ না দিলেও আর উঠিয়া যায় না। আজকাল তাহাকে অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করিতেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। সে দিন কি এক ফুটবল খেলায় জেতা উপলক্ষে রুদ্রকুমারের কলেজের ছুটি ছিল। সারাদিনটা মেসে বসিয়া থাকায় সেই সব নানা চিন্তা তাহার মনের ভিতর দিয়া উঁকি মারিতেছিল। রুদ্রকুমার ভাবিল, যাই রাস্তায় একটু বেড়াইয়া একেবারে পড়াইতে চলিয়া যাই। অল্পক্ষণ বেড়াইবার পর কখন যে তাহার পদযুগল তাহার ছাত্রের গৃহের দিকে চলিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে সেখানে উপস্থিত করাইয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। পড়াইবার ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘড়ী খুলিয়া দেখে তখনও তাহার ছাত্রদের আসিতে প্রায় পনের মিনিট বিলম্ব আছে। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় মাধুরী কি একখানা বই লইতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই রুদ্রকুমারকে দেখিয়া লজ্জায় অঞ্চল টানিয়া বাহির হইয়া গেল। রুদ্রকুমার দেখিল এক অতি সুন্দরী তন্বঙ্গী সেই ঘরে আসিয়াই চলিয়া গেল। সে ভাবিল, এই অপূর্ব্ব রূপসীই কি মাধুরী! কি সুন্দর

দেহের গঠন, সুগোল, সুঠাম ও স্বাস্থ্যব্যঞ্জক। কি টানা টানা চোখ, কি যুগ্ম ভ্রূ, কি সুন্দর সুচিক্কণ কেশে পিঠ ঢাকিয়া গিয়াছে। আন্দাজে বয়স ষোল সতের বোধ হইল। শরৎবাবুরা একটু আধুনিক দলের বলিয়াই এতদিন বুঝি মাধুরীর বিবাহ দেন নাই। যাহা হউক, আমাদিগের রুদ্রকুমারের মনে কিন্তু একটা তুমুল ঝড় উঠিল। ছিঃ রুদ্রকুমার, এ যে 'নরকের দ্বার'। দৈবাৎ সে সময়ে রুদ্রকুমারের ছাত্র দুইটির সহিত মুরারিও সেই ঘরে প্রবেশ করিল। মুরারি কিন্তু এই ঘটনাটা দেখিয়া ফেলিয়াছিল। সে রুদ্রকুমারকে কিছু না বলিয়াই তাহার কাছে গিয়া বসিল। ছাত্র দুইটি পড়িতে আরম্ভ করিল। রুদ্রকুমারের মন তখন এই লোক ছাড়িয়া কল্পনা-লোকে বিচরণ করিতেছে; সুতরাং ছাত্রেরা ভুল পড়িলেও তাহার কানে পৌঁছিতেছিল না। খানিকক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া মুরারি বলিল, 'রুদ্রকুমার, তোমার কি হয়েছে?' রুদ্রকুমার একটু চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তখনি উত্তর দিল, 'না কিছু নয়, এতটা দূর রোদে এসেছি কিনা, তাই এরকম বোধ হচ্চে।' মুরারি বলিল, 'তা ত হবারি কথা, দূর ত কম নয়, কোথায় বহুবাজারে আমাদের মেস, আর কোথায় এই দর্জ্জিপাড়া। তুমি বলে এতদূর পড়াতে আসতে স্বীকার করেছ।' এই বলিয়াই একটু মুচকি হাসিয়া রুদ্রকুমারকে বলিল, দেখ, আজ ওদের ছুটি, চল বেড়িয়ে আসি।' অগত্যা মুরারির কথায় ছল পাইয়া রুদ্রকুমার আপনার মান বাঁচাইবার জন্ত সেদিন ছাত্রদের ছুটি দিয়া মেসে ফিরিল।

রুদ্রকুমারের আরও অধিক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে যে শুধু 'নরকের দ্বার' সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে বসিয়া থাকে, তা নয়, আবার মাঝে মাঝে নাকি যোগও দিয়া থাকে। কিন্তু কথা বার্ত্তায় সে এতদুর অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল যে, প্রায়ই অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত। যাহা হউক, মনের উপর চোখ রাঙ্গাইয়া সে পড়ান কাজটা চালাইতে লাগিল। আর একদিন যখন সে পড়াইতে বাহির হইয়াছে, একমনে চিন্তামগ্ন হইয়া পথে চলিতেছে, সহসা শুনিল কে ডাকিতেছে, 'মাষ্টার মশায়, আজ আমরা পড়্‌ব না; আমি, দাদা ও দিদি মামার বাড়ী যা'চ্ছ।' রুদ্রকুমার দেখিল, একখানি খোলা গাড়ীতে বসিয়া তাহার ছোট ছাত্রটি ঐরূপ ভাবে সম্ভাষণ করিতেছে। তার পাশে বসিয়া মাধুরী। আর এক দিকে তাহার বড় ছাত্রটী ও মুরারিচরণ। মাধুরীর পূর্ব্ব উপকারস্মরণে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই চারি চক্ষের মিলন হইল। মাধুরী লজ্জায় অমনি চক্ষু নামাইয়া লইল। মুরারী মুচকি হাসিয়া রুদ্রকুমারের দিকে একটা অর্থব্যঞ্জক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

(৪)

রুদ্রকুমারের মাথাটা একেবারেই ঘুরিয়া গিয়াছে। সে মেসে ফিরিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া শুইয়া মাধুরীর কথাই ভাবিতেছে, তখন বিস্তু শঙ্করের এতবড় ভক্ত শিষ্যের খেয়াল

নাই, সে আজ সেই 'নরকের দ্বারে'র কথাই ভাবিতেছে। পরদিন সে মাথাধরার অছিলায় কলেজ কামাই করিল, ঘরে বসিয়া বসিয়া কড়িকাঠের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ভাবিতেছে, না কড়িকাট গুণিতেছে, না সেখানে একখানি সুন্দর মুখের ছবি দেখিতেছে, কে জানে। হঠাৎ কতকগুলি জিনিষপত্র লইয়া মুরারি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। রুদ্রকুমার নিজের চিন্তায় এমন বিভোর যে মুরারির প্রবেশ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে নাই, দেখিয়া মুরারি গুন্ গুন্ সুরে গান ধরিল—

শুধু তার গান শুনেছি, আর নিমেষে দেখেছি,
অমনি মাথাটী খেয়ে ফেলেছি।

রুদ্রকুমার চমকাইয়া উঠিয়া বলিল—'কি হে মুরারি, কতক্ষণ?' সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মুরারি বলিল —'কি হে, কি জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সমাধান হচ্ছিল? দেখ, অত দূর পড়াতে যেতে তোমার বড় কষ্ট হয়, তাই আমি নিকটেই একটা টিউসিনি সংগ্রহ করেছি। তুমি সেটা নাও। আমি শরৎবাবুকে বল্‌ব এখন, তিনি সব শুন্‌লে তোমাকে রেহাই দিতে রাজী হবেন বোধ হয়।' এই কথা শুনিয়াই রুদ্রকুমার লাফাইয়া উঠিয়া মুরারির দুই হস্ত ধরিয়া বলিল—'তোমার পায়ে পড়ি মুরারি, তুমি ভদ্রলোকের কাছে ওকথা উত্থাপন ক'র না, আমার পড়াতে যেতে কিছুই কষ্ট হয় না। ছিঃ, এতদিন পড়িয়ে নাকি এমন করে ছাড়া যায়।' মুরারি কিন্তু জানিত ইহাই একমাত্র কারণ নহে, ইহা অপেক্ষা প্রবলতর কারণ আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রুদ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—'মুরারি, তুমি আজ আফিস গেলেনা যে, হাতে ওটা কি হে?' মুরারি বলিল—'না, আজ বড় একটা দরকারী কাজ হাতে এসে পড়্ল, তাই আফিস যেতে পার্লুম না। এই ছবি. ক'খানা জনষ্টন হফ্ম্যানের ওখান থেকে তুলিয়ে আনলাম, একখানা পাঠিয়ে দিয়ে এলুম।' এই কথায় রুদ্রকুমারের মনটা ছনাৎ করিয়া উঠিল, সে বলিয়া উঠিল—'কার ছবি? কোথায় পাঠালে? দেখি কেমন।' এক সঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন করিয়া সে যেন দম লইতে লাগিল। মুরারি উত্তর করিল—'এ আর তুমি দেখ্বে কি, এ এক 'নরকের দ্বার'। হাতে লাগ্লে ত তোমায় গঙ্গা স্নান কর্তে হবে।—এ মাধুরীর ছবি।' মাধুরীর নাম শুনিয়াই রুদ্রকুমার চঞ্চল হইয়া উঠিল—'আরে দেখিনা কেমন তুলেছে, আমি কি তোমার ওসব দেখ্তে যাচ্চি, দেখ্ব শুধু ঠিক তুল্তে পেরেছে কিনা।' মুরারি মুচকি হাসিয়া তাহাকে একখানি মাধুরীর ছবি দিয়া বলিল—'এই এদের মামা হল আমার শ্বশুর, মাধুরীর বাবা আমার পিস্ শ্বশুর, আমার উপর ওর সম্বন্ধের ভার দিয়েছেন। সেদিন ওরা আমার সঙ্গে আমার শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছিল, পথে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। মনে পড়ে?' রুদ্রকুমার বলিল—'হবে।' মুরারি বলিতে লাগিল—'দেখ, তোমরা হ'লে মাধুরীদের পাল্টা ঘর, তুমি যদি এই 'নরকের দ্বার' বরদাস্ত কর্তে পার্তে, তা হলে আমার ভাবতে হ'ত না, মাধুরীর বাপও একটা মস্ত ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পেতেন। তোমার মত যোগ্য

ব্যক্তির হাতে, তার উপর আমার বন্ধুর হাতে মাধুরীকে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তাম।' রুদ্রকুমারের হৃদয়ের শোণিত অতি দ্রুত বহিতে লাগিল, তাহার নাড়ীর চাঞ্চল্য অনুভব করিলে মনে হইতে পারিত তাহার বুঝি জ্বর হইয়াছে। মুরারি বলিতে লাগল—'কিন্তু আমাদের কপাল, তা'ত হবার নয়, তুমি একেবারেই 'নরকের দ্বারে'র দ্বারস্থ হ'বে না, ভীষ্মের পণ। যাক্, ঈশ্বরের কৃপায় একটী পাত্রের সন্ধান করেছি, তার কাছেই ফটো পাঠালাম। সব ঠিক ঠাক, এখন ফটো দেখে মেয়ে পছন্দ হ'লেই এই সপ্তাহেই বিয়ে হ'য়ে যাবে। পাত্রের বাপ ইন্দোরে ইঞ্জিনিয়ারি করেন, পাত্র এম্-এ আর 'ল' পড়ে। মোটের উপর মন্দ নয়, তবে কিনা আমরা আশা করেছিলাম আরও বেশী। যাক্, সেখানেই বোধ হয় ঠিক হবে। শরৎ বাবুরা ত সব বন্দোবস্ত করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।—ওহে তোমার হ'ল কি, তুমি অমন কচ্চ কেন? তোমার শরীর বুঝি বড় অসুস্থ? দেখ, মাধুরীর এ সপ্তাহে বিয়ে হ'বে যখন একরকম ঠিক, সে জন্য ওদের বাড়ীতেও বিশেষ গণ্ডগোল থাকবে, আর তোমার শরীরটাও যখন ভাল নয়, তখন না হয় তুমি এ সপ্তাহে পড়াতে নাই বা গেলে।' ইতিমধ্যে কিন্তু রুদ্রকুমারের মুখ এমন শুষ্ক, এবং চেহারা এমন রক্তশূন্য ফেকাসে হইয়া উঠিল যে, মুরারি তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'দেখ রুদ্রকুমার, তোমার মনটাও শরীরের সঙ্গে বড় খারাপ হয়েছে, একটু প্রফুল্ল রাখা ত উচিত। একটা ভাল গান গাই শুন।' এই বলিয়া একটু ব্যঙ্গপূর্ণ

হাসি হাসিয়া সে পাশের ঘর হইতে একটা হারমোনিয়াম টানিয়া আনিয়া আরম্ভ করিল—

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসি রূপ গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে
তোমায় করিতে সব দান।

মুরারি গাহিয়াই চলিল, কেবল শেষ চরণে আসিয়া বার বার করিয়া গাইতে লাগিল—

আজি সব ভাষা, সব বাক্, নীরব হইয়া যাক্,
প্রাণে শুধু মিশে থাক্ প্রাণ!

আজ কিন্তু রুদ্রকুমার একটু আপত্তিও করিল না, তন্ময় ভাবে গান শুনিতে লাগিল, কেবল শেষ হইলে তাহার হৃদয় মথিত করিয়া সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। মুরারি ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল।

(৫)

পরদিন রুদ্রকুমার তাহার মাতার নিকট হইতে জরুরি টেলিগ্রাম পাইল, তাহাকে একখানি মাঝারি রকমের বাড়ী ভাড়া করিতে লিখিয়াছেন, দুই দিন পরেই তাহার মা তার ছোট ভাইকে লইয়া

বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিবেন। রুদ্রকুমার কারণ কি ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এক-খানি বাড়ী ভাড়া করিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিল। দুই দিন পরে তাহার মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে তাহার ভাই, তাহাদের এক দূর সম্পর্কের খুড়া, তাহাদের দেশের নাপিত, পুরোহিত মশায় এবং দুই চার জন আরও আত্মীয় স্বজন। সেই দিনই রুদ্রকুমারের মাতা রুদ্রকুমারকে জানাইলেন তিনি তাহার বিবাহের সব ঠিক করিয়া আসিয়াছেন, কালই বিবাহের দিন, সে আর অসম্মত হইলেও তিনি শুনিবেন না। রুদ্রকুমারের মনটা এতদূর খারাপ ছিল যে, সে 'হাঁ' কি 'না' কিছুই বলিল না। মাতা তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া ভাবিলেন, পুত্রের এখন আর বিবাহে আপত্তি নাই। রুদ্রকুমারও সুবোধ বালকের ন্যায় স্ত্রী আচারের অত্যাচার নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিল। তার পরের দিন সন্ধ্যার সময় এক মস্ত জুড়ীগাড়ী তাহাদের বাটীর দ্বারে আসিয়া হাজির। তখন খুড়ামহাশয় ও পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া বলিলেন, 'বাবা রুদ্রকুমার, লগ্ন পার হয়, উঠিয়া এস।' রুদ্রকুমার যন্ত্রচালিতের মত গাড়ীতে গিয়া বসিল, সঙ্গে উঠিল তাহার ভাই, দুই এক জন আত্মীয় ও পুরোহিত মহাশয়। রুদ্রকুমার এতদূর অন্যমনস্ক ছিল যে জুড়ী গাড়ী যে তাহার ছাত্রদের বাড়ীতে থামিয়াছে, তাহাও সে লক্ষ্য করিল না। ক্রমে তাহাকে আদর করিয়া লইয়া গিয়া এক জনাকীর্ণ ঘরের মধ্যে বরের আসনে বসান হইল। তখন তাহার যেন জ্ঞান

ফিরিয়া আসিতে লাগিল, মনে হইল যেন এ ঘর তাহার পূর্ব্বের পরিচিত। তাহাদের পুরোহিত আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল, সে হতভম্বের মত তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তাহার হাতে দেওয়া চেলীর কাপড় পরিল। তখন তাহাকে এক আলোকপূর্ণ স্থানে লইয়া গিয়া বরাসনে বসান হইল এবং অল্প পরেই এক অবগুণ্ঠনবতী কিশোরীকে তাহার সম্মুখে স্থাপিত করা হইল। তার-পর কি সব মন্ত্র পড়ান হইল। রুদ্রকুমার সকল কার্য্যই মোহাবিষ্টের মত করিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে শুভদৃষ্টির সময় যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন রুদ্রকুমার চমকাইয়া উঠিল,—এ যে মাধুরী! সে ভাবিতে লাগিল, ইহা কি সত্য না সে স্বপ্ন দেখিতেছে? এ যে তাহার কল্পনারও অতীত। সে যে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই মাধুরী তাহার হইবে। যখন রুদ্রকুমার এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, তখন কোথা হইতে মুরারি লাফাইয়া আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল,—'আহা, কর কি, এ যে 'নরকের দ্বার', রুদ্রকুমারের যে এখনই গঙ্গাস্নান করতে হবে। বোধ হয় এখনও ছোঁওয়া যায় নি, এখনও রুদ্রকুমার ভায়া সাবধান।' রুদ্রকুমার তাহার দিকে এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, তাহার অর্থ বোধ হয়, বেশ শোধ নিয়েছ মুরারি। তখন বর-কন্যার আচলে আচলে গ্রন্থি দেওয়া হইতেছিল। দূর হইতে মাধুরীর দিদিমা, যিনি সব ব্যাপার মুরারির নিকট হইতে শুনিয়া ছিলেন, রুদ্রকুমারের কানটা মলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'যা শালা, এখন 'নরকের দ্বার' আগ-লিয়ে থাক্ গে যা'। রুদ্রকুমার কিন্তু তখন এ তিরস্কারও গ্রাহ্য করিল

না ; সে তখন শুনিতেছিল দ্বিতলের একটি ঘরে তাহার শ্যালীরা গান গাহিতেছে,—

চিরজীবন সুখিনী বঙ্গরমণী, রমণীকুল প্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধরা মধুর কোকিল মৃদুস্বরা রে ;
দিব্যগঠনা লজ্জাভরণা, বিনতভুবন বিজয় নয়না,
ধীরা, মলয় ধীর গমনা, স্নেহ প্রীতি ভরা রে ।

ডেলি-পেসেঞ্জারের ডাইরী

আমার পৈতৃক বসবাস বারুইপুর গ্রামে। বেলেঘাটা ষ্টেসন হইতে ট্রেণে প্রায় সোয়া ঘণ্টার পথ, ২৪ পরগণার মধ্যে উহা একটি গণ্ড-গ্রাম। এক সময় ইহার বিস্তৃত ধানের ক্ষেত ও ফলফলারির বাগিচা শুধু যে পেটের ক্ষুধা দূর করিত এমন নয়, নয়নের ও তৃপ্তি সাধন করিত। এখন কিন্তু ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর প্রতাপে উহার লক্ষ্মী-শ্রী অনেকটা অন্তর্হিত হইয়াছে। সবুজ ধানের উপর ঢেউ খেলে যাওয়া স্নিগ্ধ বাতাস এখন পথিকের ক্লান্তি দূর করিবার সময় একটা আতঙ্ক জাগাইয়া দেয়, পাছে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ম্যালেরিয়ার বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। এ রকমে বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত পল্লীই আজ জনশূন্য, শৃগাল কুকুরের বাসস্থান হইয়া আসিতেছে। তাই আজ সারা বাঙ্গলাময় হাহাকার, স্বাস্থ্যহীন নিরন্ন দারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ। আমাদের যে পল্লীসমাজ সভ্যতা সাধনার কেন্দ্র ছিল,

সেই কেন্দ্র যখন এমনিভাবে ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছে তখন সমস্ত জাতিটা যে নিস্তেজ ও অক্ষম হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে। এ শ্মশান কবে আবার মনুষ্যের বাসভূমি হইবে কে জানে! যাক্ সে কথা, আমাদের গ্রামখানি ম্যালেরিয়ায় এমনি ভাবে নষ্ট হইলেও কতকটা বাঁচিয়া আছে। আমার পিতৃপুরুষেরা ক পুরুষ ধরিয়া এখানে বাস করিতেছেন, তা আমি ঠিক জানি না, তবে পাড়ার বৃদ্ধদের কাছে শুনিতে পাই আমারা-ই নাকি এখানকার আদিম অধিবাসী। আমাদের যে এক সময় বিশেষ বনিয়াদী ঘর ছিল, তার প্রমাণ অনেক আছে। প্রথম ত এখানকার মধ্যে আমাদের বাড়ীটই সব চেয়ে বড় পাকা দালান, কিন্তু সে দালান এখন সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হইতে বসিয়াছে। জমিজমার এখন বড় কিছুই নাই। তবে পাড়ার ঠানদিদির কাছে শুনি আমার প্রপিতামহের আমলে আমাদের জোতজম ক্ষেত খামার খুব বেশীই ছিল, তার আয় থেকে দোল পার্ব্বণ দুর্গোৎসব সবই হইত। আমার ঠাকুরদাদাও চাষবাস দেখিয়া শুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী ছিল। আয় যে তাঁহার কম ছিল তা নয়, তবে তাঁহার হৃদয়টা ছিল বড় মহৎ, কাহারও অর্থকষ্ট দেখিলে তিনি দুহাতে দান করিয়া ফেলিতেন, ফিরিয়া আর তাহা চাহিতেন না। তা ছাড়া তাঁহার অতিথিসেবা ও খুব বেশী ছিল, বারুইপুর গ্রামে গোলকচন্দ্রের অতিথিসেবা এখন কিংবদন্তীর মধ্যে পরিণত হইয়াছে। মোট কথা, ঠাকুরদা গোলক-

চন্দ্রের আমলে বংশের জমিজমার কতকটা বিক্রী হইয়া যায়। তার উপর তিনি আমার পিতাঠাকুরকে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য অনেক খরচ করিয়াছিলেন, তবে আমার পিতাঠাকুর চিররুগ্ন থাকায় খুব বেশী শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। তিনিও চাষ বাস দেখিয়াই জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু তাঁহার যে এটা আদৌ ভাল লাগিত না তা তাঁহার কাজ কর্ম্মে কথাবার্ত্তায় বোঝা যাইত। তিনি বাড়ীতে মৃত্যু পর্যান্ত লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখিয়াছিলেন এবং আমার শিক্ষার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় ও করিয়াছিলেন। ফলে যখন আমি ইউনিভার্সিটির বি এ উপাধির ছাপ লইয়া বাহির হইলাম, তখন দেখিলাম এই শিক্ষাটা ছাড়া আমার মূলধনের মধ্যে আছে একখানি জীর্ণ দালান এবং এক টুকরা ধেনো জমি। আমার পাশের সঙ্গে সঙ্গে মা আমার জেদাজেদি করিয়া একটি আধুনিক শিক্ষিতা পুত্রবধূ ঘরে লইয়া আসিলেন। লেখাপড়াটা মাকেও এত পাইয়া বসিয়াছিল যে তিনি অনেক সুন্দরী কন্যাকে তুচ্ছ করিয়াও একটি মাঝারি রকমের দেখিতে শিক্ষিতা মেয়েকে ঘরে লইয়া আসিলেন। আমার যিনি গৃহিণী হইয়া আসিলেন, তাঁর বর্ণটি উত্তম শ্যামের কিছু উপর, গড়ন মন্দ নয় এবং লেখাপড়ায় তিনি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। যাক্, বিয়ের মাস পাঁচ ছয় পর আমার পিতৃদেব আমাদের মায়া কাটাইয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন, সুতরাং আমি তাঁর একমাত্র পুত্র, আমার উপরই সংসারের সমস্ত ভার পড়িল। অনেক চেষ্টাচরিত্র উমেদারির পর এক সাহেবের

ডেলি-পেসেঞ্জারের ডাইরী

পাটের আফিসে একটি মাঝারি রকমের চাকরি জোগাড় করিয়া লইলাম। এই চাকরির ব্যাপারে হাঁটাহাটি করিতে করিতে অনেক সময়ে লেখাপড়ার উপর ধিক্কার জন্মিত, কিন্তু পরক্ষণই ভাবিতাম লেখাপড়ার ত দোষ নাই, লেখা পড়ায় যে চাকরীর সন্ধান করিয়া দিবে এমন ত কথা নাই, ইহাতে যে আমার মনের প্রসার অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই ত নাই। পেটের ক্ষুধা ভাল করিয়া দূর করিতে পারুক আর নাই পারুক, মনের ক্ষুধা যে অনেকটা মিটাইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং এটাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও সব চেয়ে বেশী লাভ। যাক্, আফিসে আমার হাজির দিতে হইত দশটার সময় এবং আমি ছিলাম বারুইপুর থেকে কলিকাতার ডেলিপেসেঞ্জার। সুতরাং রোজ সাড়ে আটটার ট্রেণে নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়া রওনা হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। আফিসের বড় সাহেব বেশ লোক ভাল ছিলেন, তবে আমার কাজের হিসাব রাখিতেন যে সাহেবটি তাঁর বিদ্যাটা যেমন অল্প ছিল, তাঁর মেজাজটাও ঠিক তেমনি চড়া ছিল, সেটা এমনি উচু পর্দ্দায় বাঁধা থাকিত যে কখন উহাতে গম্ভীর ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিবে তাহা কেহই বলিতে পারিত না। মাঝে মাঝে ট্রেণের বিলম্বের দরুণ আফিসে আসিতে দেরী হইয়া গেলে তিনি আমার উপর তার ভৈরবীর সুরটি ভাজিয়া লইতেন। তখন বড় দুঃখ হইত, মনে হইত এত লেখাপড়া শিখিয়াও গোলামী ছাড়া যখন আমাদের উপায় নাই, তখন আমাদের মূর্খ থাকিয়া আত্মসম্মান জাগিবার পূর্ব্বে সাহেবদের উপাসক হইয়া

পড়াই ভাল। হায়রে, পেয়াদায় আবার শ্বশুরবাড়ী, গোলামের আবার বিদ্যা!

রোজ আটটার মধ্যে স্নান টান সারিয়া লইয়া, আহারাদি করিয়া ট্রেণের সন্ধানে বাহির হই। আমার গৃহিণী প্রতিদিন ভোর না হইতে পাখীর গানে জাগিয়া উঠিয়া স্নান সারিয়া রান্নার জোগার করিতে থাকেন। মুখে শব্দ নাই, হাসি মুখে আটটার মধ্যে আমার রান্না করা, দুপুরে খাবার জন্য আমার টিফিন তৈয়ারী করা, পান সাজা, জামা কাপড় ঠিক করা প্রভৃতি সব কাজই এমনি গুছাইয়া করেন যে তাতে বড় ভুলচুক হয় না। কিন্তু রোজ ডেলিপেসেঞ্জারি করিয়া আর শ্বেতচরণের উপাসনা করিয়া গোলামী মগজে এতটা উত্তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল, যে মাঝে মাঝে তাহা ছোটখাট আগ্নেয়-গিরির মত ধূম উদ্গিরণ করিতে ছাড়িত না, অবশ্য সেটা বেচারা স্ত্রীর উপরই উদ্গীর্ণ হইত। কারণ আমাদের পুরুষ জাতটার প্রতাপ ত সব কিছু ঐ খানে। বাহিরে যে অপমান লাঞ্ছনা আফিসের সাহেব কিংবা বড়বাবুর নিকট আমাদের সহিতে হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া হয় গৃহে গৃহিণীর উপর। আশ্চর্য্যের বিষয়, গোলামী করিয়া করিয়া মনটা এতটাই বিকৃত হইয়া যায় যে ইহাতে কাহারও মনে অনু-শোচনাও আসে না। আমারও মাঝে মাঝে স্ত্রীর উপর অন্যায় ব্যবহার করিলেও পরে কোনও রূপ অনুতাপ আসিত না। কিন্তু স্ত্রী-বেচারী তাহাতে কোন ও রূপ সাড়া শব্দ না দিয়া অধোবদনে

কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইত। অথচ বাস্তবিক আমি স্ত্রীকে যথেষ্ট ভাল বাসিতাম, তবে যে মাঝে মাঝে পান হইতে চুন খসিলে মেজাজ সপ্তমে চড়িত, তাহার কারণ স্ত্রীর প্রতি বিরাগ নহে, তাহা দাসত্বকলঙ্কিত মনের বিকার। ইহা ত আদৌ অদ্ভুত নহে, কারণ গোলামের জাত পুরুষ আমরা স্ত্রীকে ত আর সহধর্ম্মিণী বা সহকর্ম্মিণী ভাবিতে পারি না, তাহাকে শুধু ভাবি গৃহকর্ম্মের দাসী আর বিলাসের শয্যাসঙ্গিনী।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আফিস হইতে গৃহে ফিরিবার পথে চারিদিকের শ্যামল শোভা দেখিয়া মনটা অল্পক্ষণের জন্য বেশ প্রফুল্ল হইত। পল্লীর মধ্য দিয়া যখন রেলগাড়িটি নাতিদ্রুতগতিতে পথ বাহিয়া যাইত তখন তাহার জ্যোৎস্নাধৌত শ্যামলশ্রী বাস্তবিকই নয়ন ও মনকে তৃপ্তি দান করিত। কোথায়ও দেখিতাম গ্রাম্য পুষ্করিণী হইতে কোনও পল্লীবধূ কলসী করিয়া জল তুলিয়া লইতেছে, পুষ্করিণীর একপার্শ্বে একটা মাছরাঙ্গা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে। ক্রমে ক্রমে পল্লীগৃহের আঙ্গিনায় প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, তুলসী তলায় পল্লী-বধূ আসিয়া প্রণাম করিল, কোথায়ও দাওয়ায় বসিয়া পল্লীশিশুরা কোনও পল্লী বৃদ্ধার নিকট গল্প শুনিতে বসিয়াছে। তার পর যখন উন্মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়া রেলগাড়ীটি ছুটিয়া চলিত, তখন জ্যোৎস্নাপক্ষের চাঁদ উঠিলে মনটা কেন যে খামকা নৃত্য করিতে থাকিত, ঐ শ্বেত কিরণের সঙ্গে নাচিয়া না চয়া কোন্ অজানা লোকে ছুটিয়া যাইতে চাহিত। বাস্তবিক তখন এই গোলামী মগজে কবিত্বের উদয় হইত। ক্রমে

চোখ যখন ক্লান্ত হইয়া আসিত, তখন বাহির হইতে ভিতরে মনটাকে লইয়া আসিতাম, সেখানে তখন নানা রকমের গল্প গুজব গান টপ্পা চলিত। হয়ত আমার পাশ হইতে একটি যুবক গাহিয়া উঠিল—"হেসে নাও দুদিন বৈত নয়।" বাস্তবিক তার অঙ্গভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিত। হয়ত বা কোনও হতাশ প্রেমিক এক পাশ হইতে বলিয়া ফেলিলেন—"না জীবনটা কিছু না, একটা ইঃ, একটা উঃ, একটা আঃ।" আর কোনও স্থানে বা একদল ছোকরা গল্প করিতেছে। দুই একদিন আগে তাহাদের মধ্যে একজন থিয়েটার দেখিয়া আসিয়াছে, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কাল মনোমোহনে যে সাজাহান প্লে দেখলাম, একবারে চমৎকার, দানীবাবুর আরঙজেব পার্টটা একটা তাজ্জব ব্যাপার।" কোনওখানে বা আমার মত কোন কেরাণী নিজের জীবনে বিরক্ত হইয়া হয়ত গাহিয়া উঠিলেন —

"সারাদিন খেটে খেটে প্রাণপাখী যায় খাচা ছেড়ে
কেরাণী জীবন ফেলে লোটা আর কম্বল নেরে।"

এমনি ধারা কত লোকের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে শুনিতে, কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া কখনও বা তাদের সহানুভূতি করিয়া আফিস হইতে গৃহে ফিরিতাম।

* * * *

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে যেমন চারিদিকের গভীর অন্ধকারের মধ্যে আকাশের গায়ের ধ্রুবতারাটি মাঝি মোল্লাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, তেমনি আমার এই অবসাদ ভারাক্রান্ত হৃদয়কে সংসার পথে

চালাইয়া লইয়া যাইত আমার জীবনের ধ্রুবতারা আমার জীবন-সঙ্গিনী। কেরাণী জীবনে তাপদগ্ধ মনের উপর যদি এই কোমল প্রলেপ না থাকিত, তবে সেই পোড়া মন কবে যে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত কে জানে। অফিস হইতে গৃহে ফিরিতে না ফিরিতেই মধুর হাসিটি হাসিয়া প্রত্যহ আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ানই তাহার নিয়ম ছিল। তারপর বস্ত্রপরিবর্ত্তন করা হইলে কিছু জলযোগ দিয়া পাখা খানি লইয়া সে যখন আমায় ব্যজন করিতে থাকিত, তখন বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না তাহার হাতের পাখার হাওয়াটা অধিক স্নিগ্ধ না তাহার হাস্যবিকশিত পুষ্পিত দেহলতাখানি অধিক মনোজ্ঞ। জীবনের গুরুভার লঘু করিবার এই যে একটা অবকাশ, ইহাই যে জীর্ণ মনের সঞ্জীবনী এ কথা শুধু তখনই বোধ হইত যখন অল্পক্ষণ মাত্রের আলাপে সারাদিনের অবসাদ কোথায় পলাইত কে জানে। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, মাতার সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া শেষ হইয়া আসিলে আমরা দুইজনে মায়ের কাছে বসিয়া গল্প করিতাম, ইহাতে মায়ের অনুমতি শুধু নয়, আগ্রহ ও ছিল। কোনও কোনও দিন মায়ের অনুরোধে আমার স্ত্রী দুই একটি কীর্ত্তন গান গাহিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিত। বলিতে ভুলিয়াছিলাম, আমার স্ত্রী গীতবাদ্যেও বিশেষ দক্ষা ছিল। তারপর আহারাদি করিয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিতাম, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ও আসিত; কিন্তু তখন অধিক্ষণ বসিত না। বরাবরই স্ত্রীলোকের লেখপড়ায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং আমার স্ত্রী যদিও কিছুদূর শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে

আরও উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সকল বিষয়ে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইলেও লেখা পড়া শেখা বিষয়ে সে আমার কথা কাণে তুলিত না। বোধ হয় এ শিক্ষার উপর তাহার আদৌ আসক্তি ছিল না! এক একদিন আমি জেদ করিয়া বসিতাম, আজ তাহাকে পড়িতেই হইবে। অমনি সে আমার নিকট হইতে সরিয়া যাইত। আমি অভিমান করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বসিতাম, অল্পদূর গিয়া সে আমার গম্ভীর মূর্ত্তির পানে চাহিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিত, হাসিয়াই বলিত—"দেখ, মা ডেকেছেন মার কাছে যাই, রাগ করো না, কাল পড়বো, বুঝলে।" ঐ শেষের "বুঝলে" শব্দটি এমন প্রেমমিশ্রিত সুরে বলিত যে আমার সকল অভিমান দূর হইয়া যাইত, আমি তখনি যাইতে অনুমতি দিয়া বলিতাম—"আচ্ছা যাও, কাল পড়ো।" তারপর শয্যায় শুইয়া থাকিয়া যতক্ষণ না নিদ্রামগ্ন হইতাম, ততক্ষণ তাহার কথাই প্রাণে জাগিয়া থাকিয়া কি যে সুধারস ঢালিতে থাকিত, তাহা কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন। কোনও কোনও দিন যখন অধিক রাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত, দেখিতাম আমার পায়ের উপর একরাশ চুল সমেত মাথাটা রাখিয়া বেশ স্বচ্ছন্দ মনে সে নিদ্রা যাইতেছে। তখন ভাবিতাম রাজারাও কি আমার চেয়ে সুখী। ঐশ্বর্য্যে সুখ আছে কি না জানি না, ক্ষমতায় আছে কি না জানি না, পদ মর্য্যাদায় আছে কি না জানি না, তবে সুখ যদি মনের বিমল আনন্দ হয় তবে বলিব তাহা বিশ্বের এই প্রেমরাজ্যে, তাহা নিশ্চয়ই এইখানে।

*　　*　　*

হঠাৎ একদিন অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতময় জাগিয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী বলিলেন "দাসত্ব করিয়া বিলাস স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া কোথায় যাও, ফিরিয়া চাও।" মুহূর্ত্ত মধ্যে ভারতবাসী দৈববাণী শোনার মত থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার মানুষ হইবার জন্য একটা উদ্দাম ব্যাকুলতা সকলের মনে জাগিয়া উঠিল। আফিস হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে রেলগাড়ীতে প্রায়ই যুবকদের মুখে এই গানটি শুনিতাম :—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
　　মাথায় তু'লে নে রে ভাই ;
দীন দুখিনী মা যে তোদের
　　তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
　　অপার স্নেহ দে'খ্‌তে পাই ;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
　　পরের দোরে ভিক্ষা চাই।"

এই গানটি শুনিয়া মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিত, মনে হইত সত্যই আমরা কোন অপথে বিপথে চলিয়াছি, ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই। মনের মধ্যেই আবার তখন কে বলিত, "আছেই ত, 'আবার তোরা মানুষ হ'।" ভারাক্রান্ত মনে বাটীতে ফিরিয়া আসিতাম, আসিয়া দেখিতাম আমার মা ও আমার স্ত্রী দুজনেই এ

বিষয় আলোচনা করিতেছেন। দেখিয়া বাস্তবিকই আমার আনন্দ হইত; যাহাদের প্রাণ ভরিয়া ভালবাসা যায় তারাও যদি আমার চিন্তার ভার গ্রহণ করেন, তবে সেটাকি অল্প আনন্দের কথা! তার-পর আহারাদি শেষ হইলে আমরা তিনজনে দেশের সম্বন্ধে অনেক গল্প করিতাম। কি করিব তখনও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই, তবে গোলামী যে ভাল নয়, তাহাতে যে মানুষ আর মানুষ থাকে না, ইহা আমরা তিনজনেই স্বীকার করিতাম এবং উহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহাও স্থির করিলাম।

একদিন আফিস হইতে বাটী আসিয়া দেখি আমার মাতা ও আমার গৃহিণী দুই জনে দুইটি ঘরে দুইটি চরকা লইয়া সূতা কাটিতে বসিয়াছেন। মায়ের ঘর হইতে স্ত্রীর ঘরে আসিতেই সে আমার দিকে তাকাইয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর সূতা কাটিতে কাটিতে হাসিয়া গান ধরিল—

"চরকা আমার ভাতার পুত চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বাঁধা হাতি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বেশ ত, বেশ কাজ পেয়েছ, বুঝলাম দেশের কাজ কচ্ছ, কিন্তু আমার স্থান যে ও অধিকার করবে, ইহাই আমার অসহ্য।" আমার কথা শুনিয়া গৃহিণী হাসিতে হাসিতে আবার ঐ গান ধরিল। তারপর, অনেকক্ষণ তাহারা কেমন করিয়া চরকায় সুতা কাটিতে শিখিয়াছে, কেমন্ করিয়া পাড়ার ছুতার মিস্ত্রীকে দিয়া পুরাণ ধরণের দুইটা চরকা তৈয়ারী করাইয়াছে, তাহার ইতিহাস

আমার কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। আমিও বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম।

* * *

ইতিমধ্যে আমার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, মা তাহাকে কোলে লইয়া সারাদিন চরকায় সূতা কাটিতেন। একদিন সূতা কাটিতে কাটিতে হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন! আমি তখন আফিসে, আমার স্ত্রী জল দিয়া বাতাস করিয়া তাহাকে সুস্থ করিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল, কিন্তু আর কিছু ঔষধ পত্র দিতে পারে নাই। আমি আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মায়ের বিষম জ্বর, বিকারের লক্ষণ, ডাক্তার ডাকিলাম, তিনিও ভরসা দিতে পারিলেন না, কেবল বলিলেন খারাপ রকমের জ্বর, কি হয় বলা যায় না। তারপর দিন আফিসে গিয়া এক সপ্তাহের ছুটি চাহিলাম, বড় সাহেব রাজী থাকিলেও ছোট সাহেবের প্ররোচনায় আমার ছুটি মঞ্জুর হইল না। ছোট সাহেব বলিলেন, বুড়া মায়ের অসুখ তাহাতে আবার ছুটি কেন, হাঁসপাতালে দাও। হায় রে, এই ত পাশ্চাত্য শিক্ষা, ইহার জন্য আমরাও লালায়িত। যে শিক্ষায় পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ঈশ্বর ভক্তি শিখায় না, তাহা নিশ্চয়ই শিক্ষা না, শিক্ষার প্রেত মাত্র। ব্যথিত হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম মায়ের বিকারের ঘোর সম্পূর্ণ দেখা দিয়াছে। ডাক্তার ডাকিলাম, ডাক্তার ঔষধ দিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করি! যাক্, পরের দিনও আফিসে গেলাম, মনটা খুবই খারাপ লাগিতে

লাগিল, বাম চক্ষু বারে বারে নাচিতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল, কি যেন অশুভ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার সময়ে গৃহে প্রবেশ করিলাম,প্রবেশ করিতেই স্ত্রীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম সব শেষ হইয়া গিয়াছে, এতদিনে মাতৃহারা হইলাম। যাহা হউক, মায়ের সৎকারাদি করিয়া বাটী ফিরিলাম। এ চাকরী আর করিব না স্থির করিলাম। যাহাতে শেষ মুহূর্ত্তে মাতাকে সেবা করিবার সুযোগ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিল, সে গোলামী ত্যাগ করিবই। পরে কি করিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

মাতার মৃত্যুর পর হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে খোকার অসুখ করিল, তাহার লক্ষণ ও ভাল বোধ হইল না। ডাক্তার ডাকিয়া ঔষধ দিয়া খোকার শিয়রে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—"ভগবান্, এ আবার কি পরীক্ষা, এমন কি পাপ করিয়াছি, যাহার জন্য এত আঘাত ?" ভাবিতে ভাবিতে বেলা হইয়া গেল, কখন আটটা বাজিয়া গেল লক্ষ্য করি নাই, স্ত্রী আসিয়া তাড়া দিয়া বলিল, "আফিস যাবে না, শীঘ্র খেতে এস।" উঠিয়া আহার করিতে গেলাম। গোলামের যে পুত্রের অসুখেও ভাবিবার সময় নাই, একথাটা ভুলিয়া যাওয়াই যে মস্ত অপরাধ। মনের দিকে তাকাইয়া একটা বিদ্রূপের হাসি হাসিলাম। পোষাক পরিয়া আফিস যাইবার পূর্ব্বে আবার খোকাকে দেখিতে আসিলাম, আমাকে দেখিয়া খোকা ভাঙা ভাঙা কথায় বেদানা চাহিল। আমি বলিলাম, আসিবার সময় লইয়া

আসিব। ট্রেণ ধরিতে রওয়ানা দিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ ঠিক সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। ছুটিয়া ষ্টেশনে আসিলাম, ঠিক তখনই যেন আমাকে উপহাস করিয়া খলখল শব্দে পৈশাচিক হাসি হাসিয়া ট্রেণটা চলিয়া গেল। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম, দুই ঘণ্টার মধ্যে আর ট্রেণ নাই, আজ না জানি ছোট সাহেবের কাছে কি লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইবে। বেলায় আফিসে আসিলাম, আসিবামাত্রই ছোট সাহেব অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া গালি দিতে লাগিল। আমার মনটাও সেদিন বিরূপ ছিল, আমিও দুই চারিটা কড়া কথা শুনাইয়া বলিলাম, আমি তোমার চাকরী ছাড়িয়া দিলাম।" সাহেব বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল—"ও, তুমি non-co operator হবে, বেশ, শুনে সুখী হলাম! তবে একমাস থাক, আমরা লোক দেখে নি।" আফিসে বসিয়া বসিয়া গুমরাইতে লাগিলাম, কিন্তু সেদিন তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া যাওয়া হইল না। গভীর ঘনঘটা করিয়া ভীষণ বর্ষা আরম্ভ হইল, মাঝে মাঝে বিজলী চমকাইতে লাগিল, মনে হইল সৃষ্টি বুঝি এইবার ধ্বংসের পথে চলিল। জানালার ধারে বসিয়া সেই মেঘ ও বৃষ্টি দেখিতে দেখিতে আমার অদৃষ্টের সঙ্গে তাহার তুলনা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ ছোট সাহেবের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম, সংবাদ লইয়া জানিলাম এক দরিদ্র ভিখারী ঝড় বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাকেই বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দিতে গিয়া ছোট সাহেব গর্জ্জন করিতেছে। ভাবিতে লাগিলাম, এরা মানুষ না পশু; অথবা এই গোলামের

জাতিটাকেই উঁহারা পশুর মত মনে করেন। তখন বুঝিলাম কেন মহাত্মা গান্ধী ইহাদের সকল সংশ্রব ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ হইয়া না বাঁচিতে পারিলে এ রকম গোলামী করিয়া যে কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ বাঁচাকে' ধিক্কার দেওয়া এ বোধটা আমার চক্ষে সে দিন স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। অনেক ক্ষণ পরে প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলে, ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভারাক্রান্ত মনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই মনে পড়িয়া গেল, খোকার জন্য ত বেদানা লওয়া হইল না। পোড়া মন স্নেহের দাবিটাও যে ভুলিয়া গেল ইহাই ত বারে বারে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। গাড়ীতে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। জানিনা এখনও কত দুঃখ আমার জন্য সঞ্চিত আছে। চাকরী ত ছাড়িয়া দিলাম, এখন কি করিয়া আহারের সংস্থান হইবে ইহাই ভাবিতে লাগিলান। হঠাৎ ট্রেণের এক কোণে একটি যুবক গাহিয়া উঠিল—

"তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত ;
মায়ের ঘরের ঘি সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান।"

মনের মাঝখান হইতে কে বলিয়া উঠিল, এই ত পথ, এই ত আমাদের অধিকার, তবে ভাবনা কি। ভাবিয়া ত আর কুলকিনারা পাওয়া যায় না, যিনি সব ভাবনার মালিক, তিনিই আমাদের জন্য

ভাবিতেছেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে সকল কথা বলিয়া ভবিষ্যতে চাষ করিয়া খাইব এই কথাও তাহাকে জানাইলাম। আমার ভয় ছিল পাছে সে স্বীকৃতা না হয়। কিন্তু যখন অতিশয় উৎসাহের সহিত গৃহিণী এই প্রস্তাবে সম্মতা হইল, তখন আমার বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল এবং আপনাকে এত দুঃখের মধ্যেও ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হইল।

খোকার জ্বর কিন্তু ছাড়িতে চাহিল না। ভুগিয়া ভুগিয়া দশদিনের দিন সে আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেল। উপরি উপরি দুইটা শোকে একেবারে মনটা অবসন্ন হইয়া পড়িল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কান্নাকে শেষ করিতে পারিতেছিলাম না। আমার গৃহিণী আমার অবস্থা দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য রকমের ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, "তুমি অত কষ্ট করছ কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছায় খোকা তার ঠাকু'মার কাছে চলে গেছে, এস আমরা এখন বন্ধনহীন হয়ে দেশের কাজ করি।" স্ত্রীর কথায় কতকটা শান্তি লাভ করিয়া আমাদের ভবিষ্যতের কার্য্যের পন্থা আলোচনা করিতে লাগিলাম। দুই একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাসে বুঝিতে পারিতেছিলাম কত বড় ব্যথা সে বুকে চাপিয়া রাখিয়া সহজ ভাবে আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিল। এই ত ত্যাগ! এই ত নিষ্ঠা!

আফিসে আজ শেষ দিন গিয়া কাজ বুঝাইয়া চলিয়া আসিবার কথা। সমস্ত দিন পরিচিত সহকর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া নিজের অদৃষ্টের কথা বলিয়া, দেশর সেবা করিবার ইচ্ছা জানাইয়া সকলের

উপদেশ, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়া ফিরিলাম। ফিরিয়াই দেখি বিনা মেঘে বজ্রপাত। আমার নয়নের মণি, আমার স্নেহময়ী গৃহিণী গ্রাম্য কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। তখনি ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পরদিন সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমার গৃহ অন্ধকার করিয়া আমার আনন্দের দীপটা নির্ব্বাপিত হইল। এত নিদারুণ ব্যথায় কান্না পর্য্যন্ত বাহির হইল না, প্রচণ্ড ব্যথার জ্বালায় চোখের জলের উৎস ও যেন শুকাইয়া গিয়াছে। যেমন ভীষণ আঘাত লাগিলে একটা কাল শিরা দাগ পড়িয়া সে স্থানটাকে অবশ করিয়া দেয়, রক্ত ও পড়ে না, বেদনার অনুভূতি থাকে না; সেইরূপ এই বিরাট বেদনা আমার হৃদয়কে যেন অসাড় করিয়া দিয়া গেল। দূরে দুই একটি তারা উঠিয়া বলিয়া দিয়া গেল—আমরা শুধু শাশ্বত, আর সবই ভঙ্গুর, আমরা শুধু ভাসিয়া ভাসিয়া যাই, তোমাদের শুধু কর্ত্তব্য, তোমাদের হাসিবার, গর্ব্ব করিবার, আনন্দ করিবার কিছুই নাই। অনতিদূরে একটি শিবমন্দিরের ভাঙ্গা অঙ্গনে একটি সাধু তখন গাহিতেছিল—

"আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব্ব করিতে চুর।"

সেদিন ১১ই ডিসেম্বর, রবিবার। সারা ভারতের নব জাগরণের হিল্লোল পদ্মার বিপুল তরঙ্গের তালে তালে নাচিতে নাচিতে বুড়ী-গঙ্গার শান্ত বুকের উপর দিয়া ঢাকানগরীর তটপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানবের স্বাধীন চিন্তার উপর হস্তক্ষেপ, তাহার শান্তিপূর্ণ দেশহৈতিষণার প্রতি সন্দেহ, দেশবাসী নির্বিরোধ-প্রতিবাদ ও আইনলঙ্ঘনের দ্বারা প্রতিকার করিতে উদ্যত হইল। ফলে, দেশ-প্রেমিক কর্ম্মবীরগণ কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু যখন ১০ই ডিসেম্বর তারিখে অবরোধ-বিধি তাহার সীমায় আসিয়া পৌঁছিল এবং ভারতপূজ্য ত্যাগিশ্রেষ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কারারুদ্ধ হইলেন, তখন দেশবাসীর মধ্যে একটা প্রচণ্ড চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল। আজ ১১ই তারিখে তাই বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঢাকা-নগরীতেও দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পথে পথে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

"ঝন্—ঝন্—ঝন্
খুলিয়াছে ওই তোরণের দ্বার,
আয় সন্তানগণ!

আয় শত শত হাজার হাজার,
রেখেদে চিন্তা, রেখেদে বিচার,
অদূরে মায়ের মরকত মোড়া
হৈম সিংহাসন।
বহুদিন—ওরে বহুদিন ভাই,
কি যেন নেশার লোভে,
কাটিয়াছে তোর দীর্ঘ দিবস
ব্যর্থ আশার ক্ষোভে।
আজ খুলিয়াছে মুক্তির দ্বার,
ডেকেছে জননী সন্তানে তার,
লজ্জা সরম রাখিতে এবার
কর রে জীবন-পণ।”

ক্রমে প্রথম দল ঢাকা স্কুল প্রাঙ্গণ পার হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের নিকট উপস্থিত হইল। দুইজন সার্জ্জেণ্ট আসিয়া প্রথম দলের নেতা সুশীল বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। দলের অন্যান্য সকলে যখন আত্মসমর্পণ করিয়াও অবরুদ্ধ হইল না, তখন গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া চলিল—

“ওরে রে মরণ-যাত্রি।
অদূরে হাসিছে উষার সুষমা,
আর নাই কালো রাত্রি।

সকল বিষাদ প্রেমে কর জয়,
সকলের প্রেমে মাতাও হৃদয়,
জগত ভরিয়া দাও পরিচয়—
মা তোর জগদ্ধাত্রী।”

* * * *

আজ ১২ই ডিসেম্বার, সোমবার। সবেমাত্র আদালত খুলিয়াছে, তখনও ১২টা বাজিতে বিলম্ব আছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই আদালত গৃহ দর্শক ও স্বেচ্ছাসেবকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ সুশীলকুমারের বিচারের দিন। সুশীলকুমার ঢাকানগরীতে বিশেষরূপেই পরিচিত। ছাত্রজীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীর কত প্রশংসা সে পাইয়াছে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া যখন সে গবেষণাবৃত্তি পাইল, তখন তাহাকে সকলে সোণার টুকরা বলিয়া আদর করিয়াছে। অল্প দিন হয় ঢাকা-কলেজের অধ্যাপকপদে মনোনীত হইয়াও দেশজননীর আহ্বানে সে সহযোগিতাবর্জ্জন-আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষ বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আত্মীয় স্বজন অনেক ধমকাইয়া শেষে মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া জবাব দিলেন। ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট মাতুল মহাশয়—যিনি পূর্ব্বে সুশীলকুমারের বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রশংসায় শত-মুখ হইতেন, তিনিও মূর্খ বাতুল বলিয়া তাহাকে গালাগালি দিয়া সম্পর্ক ত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন; কিন্তু মানুষের মনে যখন একটা প্রেরণা জাগে, সে তখন কে কি

বলিল বা ভাবিল ইহা লক্ষ্য করিবারও ত সময় পায় না। তাই সুশীলকুমার যখন কর্ত্তব্যের ডাকে দেশজননীর আহ্বানে বাহির হইয়া পড়িল, তখন কোনও কথা তাহার কাণে পশিল না। দুঃখ কষ্টকে বরণ করিয়া লইয়া দেশের সেবা করাই, সে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য স্থির করিল। আজ ভগবানের কোন্ ইচ্ছার ইঙ্গিতে সুশীলকুমারের বিচারের ভার পড়িয়াছে তাহার একমাত্র মাতুল ঢাকার প্রথম ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট হিমাংশুমোহনের উপর। তাই শুধু সুশীলকুমারের গুণমুগ্ধ হইয়াই দেশবাসী আজ আদালতে ঝুঁকিয়া পড়ে নাই, তাহা ছাড়া এই অপূর্ব্ব বিচাররহস্য দেখিবার জন্য অনেকের অত্যধিক কৌতুহলই তাহাদিগকে এইখানে টানিয়া আনিয়াছিল।

* * * *

হিমাংশুবাবু খুব গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এজলাসে আসিয়া বসিলেন। কঠোর বিচারক বলিয়া সরকারের নিকট তাঁহার সুযশ ছিল। তিনি আজও সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। হত-ভাগাটা যেমন তাঁহাদের সৎপরামর্শ না শুনিয়া রাজবিদ্রোহীর দলে মিশিয়াছে, তেমন ফল লাভ করুক। কিন্তু হিমাংশুবাবুর মনের এককোণে কে যেন মাথা উঁচু করিয়া বলিয়া উঠিল—"ছিঃ, দুঃখিনী বিধবা ভগিনীর নয়ন পুত্তলী যে।" অমনি তাঁহার সরকারী মনটা শাসাইয়া বলিল, "না, ও সব কোন কাজের কথা নয়, সুশীলটাকে শিক্ষা দিতে হইবে গুরুজনের অবাধ্য হওয়ার ফল কি, আর এ ক্ষেত্রে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ঠিক রাখিতে

পারিলে প্রমোশনটাও শীঘ্র হইতে পারে।" হিমাংশু বাবুর সম্মুখে সুশীলকুমারকে আনা হইল। ডেপুটি বাবু আসামীর মুখের দিকে না তাকাইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"তুমি শিক্ষিত যুবক হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে কারাবাসের জন্য অত ব্যাকুল হয়েছ কেন?" সুশীলকুমার উত্তর দিল—"প্রথমেই আমার পূজনীয় মাতুলহিসাবে আমি আপনাকে প্রণাম করি।" কথাটা শুনিয়াই হিমাংশু বাবু একটু কাঁপিয়া উঠিলেন। সুশীলকুমার বলিতে লাগিল—"এইবার বিচারক আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনি কি মনে করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য বড় সরকারী চাকরী লাভ করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করা? আর সেটা না করিলেই ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়? এর চেয়ে কি শিক্ষার বড় উদ্দেশ্য নাই? সে উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশ ও দশের সেবার যোগ্যতা। পশুরাও ত নিজের আহারের যথেষ্ট সংস্থান করে, মানুষ কি তবে পশুর চেয়ে একতিলও বড় নয়। যদি বড় হয়, সে শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? ত্যাগ ও সংযমে এবং শিক্ষার ফলে যে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে, তাহাতেই জীবনের সফলতা। জানেন রামপ্রসাদে আছে—"লোকে করে সুখের গর্ব্ব, আমি করি দুঃখের বড়াই।" জগৎ এতদিন সুখের গর্ব্ব করেই এসেছে, আজ ভারত দেখাবে দুঃখেরও বড়াই করা চলে। বিশ্বের দুয়ারে ভারত যে বাণী পাঠাবে, তার প্রথম কথাই হবে যে দুঃখ দহনের মধ্য দিয়ে ভারত মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। সে সাধনাই আমাদের স্বরাজসাধনা। জানেন আমাদের দেশপূজ্য নেতা

চিত্তরঞ্জন কি বলেছেন—"আমাদের দেশ আজ একটা বৃহৎ কারাগার।" কারাগার কার কাছে? যারা সুখের লোভে সংসারে বিচরণ করে, দু'পয়সা পেয়ে আনন্দে অধীর, ইংরেজের স্বেচ্ছাকৃত গোলাম হ'য়ে যারা জীবন নির্ব্বাহ করে, তাদের কাছে বাঙ্গলা দেশ কারাগার নয়? তবে কারাগার কার কাছে? যাদের হৃদয়ে এই দাসত্বের জ্বালা আগুণের মত জ্বল্‌ছে, তাদের কাছেই এ কারাগার। একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাণের পরতে পরতে, হৃদয়ের প্রতিস্পন্দনে বোঝা যে স্বরাজ ছাড়া আমাদের গতি নেই। এমনি ধারা স্বরাজের জন্ত একটা ব্যাকুলতা জাগলে আমরা চাইব আমাদের কারাগারের দরজা ভেঙ্গে বেরুতে। এই আকাঙ্ক্ষা যার মনে জাগবে—এই আগুণ যার প্রাণে জ্বল্‌বে, তাকে যে ইংরাজের কারাগারে ঢুকতেই হবে। আমাদের নেতৃবৃন্দ যে এমন অকুণ্ঠিত-চিত্তে কারাবাসকে বরণ করে নিচ্ছেন, তার মধ্যে তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাচ্ছে যে তাঁরা ভোগবিলাস ত্যাগ করে কারাবাসের দুঃখ কষ্ট দিয়ে সমগ্র জাতির যুগসঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করবেন। কারণ এটা নিশ্চয়ই সত্যি যে জাতির দুঃখদৈন্য প্রায়শ্চিত্ত অন্তে দুর হবেই। কারাগারেই কংসবিনাশন ভগবানের জন্ম হয়েছিল। আজ এই কারাগারে ভগবান্ কি আবার জন্মিবেন না?"

সুশীলকুমার এইখানে তাহার বক্তব্য শেষ করিল। আদালতের সকলে নির্ব্বাক হইয়া তাহা শুনিতেছিল, একটি কথাও কাহারও মুখ

হইতে ফুটিল না! কেবল সকলের মধ্যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া পরস্পরের সহিত এ বিষয়ের নিঃশব্দ আলোচনা করিয়া গেল। আদালত নিস্তব্ধ, হিমাংশুবাবু রায় প্রকাশ করিলেন—আসামীর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। সকলে স্তম্ভিত, এ কোন্ ন্যায়ের বিচার ভগবান্ জানেন! কিন্তু উপস্থিত স্বেচ্ছাসেবকগণ আনন্দিত মনে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

আজ ভারত গগনে
কি শুভ লগনে
মুক্তি-উষাহাসি ফুটিছে রে।
ঐ যে কাণে কাণে
বিহগ প্রাণে প্রাণে
তুলিল তানে তানে
আশার বাণী রে;
অলস ঘুমঘোরে
মোহের বাঁধা ডোরে
ভারত জাগে ওরে
শকতি আনি রে;
আজি পবনে পবনে
মধুর লগনে
শান্তি—সঙ্গীত ধ্বনিছেরে।

* * *

সাতলহরী

আদালত হইতে গৃহে ফিরিয়া হিমাংশু বাবু সুশীলকুমারের মাতুলানীর নিকট বলিতে লাগিলেন—"দেখ, সুশীলটা যেমন আমাদের কথার অবাধ্য হয়ে রাজ-দ্রোহীদের দলে মিশেছিল, তেমন তার আমি খুব শাস্তি দিয়ে এসেছি। এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।" শুনিয়া হিমাংশু বাবুর স্ত্রী চমকিয়া উঠিলেন, একটু স্থির হইয়া বলিলেন —"কি বললে আমাদের সুশীলের বিচারের ভার তোমার উপর পড়েছিল? তুমি তাকে এক বৎসরের কারাদণ্ড দিয়ে এসেছ? তুমি আমায় অবাক্ করলে। তার দোষ? সে রাজদ্রোহী? নিজের দেশবাসীর জন্য তার প্রাণ কেঁদেছিল, তাই সে জীবনের সব সুখ-স্বচ্ছন্দের আশা ত্যাগ করে—ভোগ বিলাসকে পায়ে দলে দেশের ভাই বোনদের দুঃখে কাঁদতে গিয়েছিল! তুমি বলবে সে বাতুল! কিন্তু এমন পাগল সব না থাকলে এই অধঃপতিত দেশ আজ কোন্ শ্মশানে পরিণত হয়ে যেত কে জানে! সে রাজদ্রোহী? অপরাধ, সে তার দেশের ভাই বোনদের উলঙ্গ অবস্থা দূর করবার জন্য তাদের চরকা ও তাঁত চালিয়ে পরণের কাপড় তৈয়ারী করতে উপদেশ দিচ্ছিল; গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের অস্বাস্থ্যকরতার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল। মস্ত অপরাধ? হাঁ, গভর্ণমেণ্টের চক্ষে মস্ত অপরাধ বই কি? তারা ত চায় না দেশের শিক্ষিত লোক গ্রামবাসীদের সাথে মিলে মিশে কাজ করে। তাতে যে দেশের দারিদ্র্য কিছু কমে। ওরা তা বলবে বটে, কিন্তু তোমরাও কি তাই বুঝবে? তোমরা না শিক্ষিত? ওঃ বুঝতে পারিনি ওদের শ্রীচরণে যে শিক্ষা বলি দিয়েছ, তোমরা যে

ওদের কেনা গোলাম। বুদ্ধি আর ঘটে কোথা থেকে থাক্‌বে!" এই বলিয়া সুশীলকুমারের মাতুলানী কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। এই হিমাংশু বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহার সুশীল দাদাকে বড় ভাল বাসিত, সে তার জেলের সংবাদ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া হিমাংশু বাবুর পত্নীর নয়নযুগলও জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, "কাঁদিস্‌নি মা, তোর সুশীল দাদা দেশের কাজে কারাগারে গেছে, সে ত আমাদের আনন্দের কথা, তার আত্মীয় বলে যে আমাদের গৌরব করবার দিন, কাঁদবার দিন ত নয়। আর, আমরা মা ও মেয়ে মিলে সুশীলের পরিত্যক্ত কাজের ভার নিই। আজ প্রতিজ্ঞা কর-দেশের ভাই বোনদের সেবায় সমস্ত প্রাণ সঁপে দেব। তারপর যখন সুশীল ফিরে আসবে, তখন দেখাব যে তার পরিত্যক্ত কাজ আমরা পড়ে থাকতে দিইনি।"

এতক্ষণ হিমাংশু বাবু নীরবে সব দেখিতে ছিলেন এবং এক মনে পত্নীর কথাগুলি শুনিতে ছিলেন। এতক্ষণে এইবার তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক বলিয়াছ, এতদিন মোহের ঘোরে নিদ্রা যাইতেছিলাম, শিক্ষার অভিমানে পদগৌরবে মনে করিয়াছিলাম আমি যাহা বুঝি তাহাই সব চেয়ে ভাল। কিন্তু আজ সে অভিমান দূর হইয়াছে। সুশীল আমার পুত্র স্থানীয় হইলে ও, আজ সে আমাদের আদর্শ। আমিও আজ হইতে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলাম এবং যতটুকু সাধ্য দেশের সেবায় প্রাণ সমর্পণ করিব।"

*　　*　　*　　*

আজ ২০শে ডিসেম্বর। ঢাকার কমিশনার সাহেব হিমাংশু বাবুকে তাহার খাসকামরায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। হিমাংশু বাবু উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন—"রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষে ২৭শে যে উৎসব হইবে, তাহার সমস্ত ভার আপনার উপর দিলাম। আপনি এখানকার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর যে রকম কার্য্যদক্ষ, তাহাতে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। আর এককথা, আপনি সে দিন এখানকার রাজদ্রোহীদের নেতাকে যে দণ্ড দিয়াছেন, তাহাতে আমরা সকলেই আপনার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনার শীঘ্র প্রমোশনের জন্য লিখিয়া পাঠাইতেছি। শুনিলাম সে ছোঁড়াটা না কি আপনার আত্মীয়, বোধ হয় দূর সম্পর্কের হবে, না? তা যাক্ বিদ্রোহীদের এমনি করে পায়ের তলায় দাবান চাই।" হিমাংশু বাবু ধীর স্থির ভাবে বলিলেন—"সে দিন যাহাকে আমি কারাদণ্ড দিয়াছি, সে আমার নিকট আত্মীয়, আমার বড় আদরের ভাগিনেয়; এখন বুঝিয়াছি দেশদ্রোহী আমরা। আমার মোহ কাটিয়াছে, অভিমান দূর হইয়াছে! তাহাকে আমি গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। আর আপনার উৎসবের আয়োজন আমার দ্বারা কিছুই হইবে না। দেশে এখন অশান্তি, উৎসবের এ সময় নয়।" এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই কমিসনার সাহেব চেঁচাইয়া উঠিলেন—"র‍্যাসকেল এখনি তোমাকে lowest grade এ নামাইয়া দিলাম।" অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া হিমাংশু বাবু বলিলেন—"অত কষ্টের আপ-

নার প্রয়োজন নাই, আমি পদত্যাগের পত্র সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছি, এই তাহা গ্রহণ করুন। আমি চলিলাম। দেশ আমায় ডাকিতেছে, আমি সেখানেই চলিলাম।"

*　　*　　*　　*

ঢাকা নগরীতে হিমাংশু বাবুর পদত্যাগের কথা গড়িয়ে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। চারি দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। দলে দলে স্বেচ্ছা-সেবক হিমাংশু বাবুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। [illegible] বাবু তাঁহার স্ত্রী কন্যার হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "ভাইবা আমার, সুশীল আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছে। এ [illegible] যে অন্ধকারে ছিলাম তার থেকে আজ আলোকে সেই আমায় [illegible] এসেছে। সে তোমাদের নেতৃস্থানীয় ছিল, আমাদের তার মত [illegible] নেই; তবে আমরা তিন জনে তোমাদের সেবা করে তার অভাব [illegible] যতটা পারি দূর করতে চেষ্টা করব। আজ আমি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে অন্তরে বাহিরে মুক্ত। আজ আমার মুক্তির দিন। [illegible] ভাই বন্দে মাতরম্। গান্ধী মহাত্মা কি জয়! দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জনের [illegible]।"

মনের লীলা

'রাঙাদা, আমরা বুঝি মজা দেখতে যাব না! বা-রে!"

"কিসের মজা ভাই?"

"এই যে গড়ের মাঠে কত বাজি হবে, রাস্তায় চারদিকে কত আলো জ্বলবে! বাঃ, তুমি বুঝি আর জান না। এত লেখাপড়া শিখেছ, এই খবরটা বুঝি আর রাখ না। না, তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করছ।"

"ওঃ, তাই বল্, আচ্ছা তুইই বল্ না, কিসের জন্য এ উৎসব হচ্ছে?"

"বাঃ, তা বুঝি আমি জানি না, আমাদের ইস্কুলের মাষ্টার মশায় যে বলে দিয়েছেন আমাদের রাজপুত্তুর কলকাতায় এসেছেন, তাই সবাই মিলে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এত ধূমধাম করছে। বাতি জ্বালিয়ে সাহেবপাড়া নাকি ইন্দ্রপুরী করে তুলেছে। না, আমি দেখতে যাবই।"

"দেখ্, কমল, এ উৎসব কারা করছে জানিস্। এ উৎসব দেশের লোক কেউ করছে না, করছে জন কতক সাহেব সুবো

যাদের এ দেশের উপর কোন টানই নেই, যারা এ দেশের দুর্দ্দশা দেখে হাসে, আর উৎসব করছে তারা, যাদের সঙ্গে দেশের কোন সম্পর্কই নেই যারা সাহেবদের উচ্ছিষ্টভোজীর দল। ভেবে দেখ কমল, যখন দেশে শতকরা নব্বইজন দুবেলা দুগ্রাস অন্ন জোটাতে পারে না, তখন কি না দেশের এত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে! কিসের উৎসব বল দেখি ভাই? এযে আমাদের বুকের রক্ত নিয়ে তাণ্ডব-লীলা। এখন কি উৎসব করবার সময় ভাই? দেশের যাঁরা প্রাণ হিন্দু মুসলমান, তাঁরা গায়ের কাজে কারাবাস বরণ করে নিয়েছেন; আর আমরা মজা করে বাজি দেখতে যাব, আর স্ফূর্ত্তি লুটব? ছিঃ ভাই।”

“না রাঙ্গাদা, আমি তোমার অত সব বড় বড় কথা বুঝি না, সকলে যাবে, আমি বুঝি যাব না। আমি যাবই, যা রে।”

“কমল, তুই যদি একান্তই যেতে চাস্ ত যা, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। আমার বোঝাবার ভার বোঝালাম। জানিস্ ত আমি কারও স্বাধীন ইচ্ছার উপর হাত দিই না। তবে আমি ত নিয়ে যেতে পারবনা। আর, কেউ যদি তোকে নিয়ে যায় ত সঙ্গে যা।”

কমলরঞ্জন পুলকিত মনে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল—

“আজ আমাদের ছুটি ওভাই
আজ আমাদের ছুটি;

কি করি আজ ভেবে না পাই
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।"

*　　　*　　　*

উপরের কথাবার্ত্তা সুখরঞ্জন বাবু ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলরঞ্জনের মধ্যে হইতেছিল। সুখরঞ্জন বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলেজের অধ্যাপনা করিতেছিলেন, এমন সময় মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ দেশভক্তের মুখ দিয়া দেশমাতৃকার আহ্বান আসিল। সুতরাং সুখরঞ্জন বাবু সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক মনে কংগ্রেসের কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রকৃতি খুব নিরীহধরণের ছিল। সে কাহারও স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহিত না, সুতরাং যখন তাহার কনিষ্ঠ সহোদরেরা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা চালাইবার ইচ্ছাই প্রকাশ করিল, তখন সে তাহাতে কোনওরূপ আপত্তি করিল না। আজ ২৭শে ডিসেম্বার তারিখে সমপাঠীদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও রাজকুমারের আগমন উপলক্ষে উৎসবাদিতে যোগদান করিতে যাইতে দেখিয়া দ্বাদশবর্ষবয়স্ক কমলরঞ্জনের কোমল মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে তাহার রাঙ্গাদাদার নিকট আসিয়া আলোক ও বাজি দেখিতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অনেক আবদার করার পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি পাইয়া

সে পাড়ার কোনও সমবয়সীর অভিভাবকের সঙ্গ ধরিতে চলিয়া গেল।

*　　　*　　　*　　　*

"রাঙ্গাদা, ও রাঙ্গাদা, বেশ মজা হয়েছে। আমি নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্র, অমনি দেখি ও বাড়ীর অনাথ, ওইযে অনাথ আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে,—ছিপছিপে ফরসা ছেলেটি যাকে তুমি একদিন খুব বুদ্ধিমানের মত চেহারা বলেছিলে,—সে আমাকে ডাকতে এসেছে। তারা সব তাদের বাড়ীর গাড়ী করে ময়দানে মজা দেখতে যাচ্ছে, আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করছে। যাব? বেশ ত যাই না? তাহলে আর কাউকে আমার খোঁজ করতে হবে না।"

"আচ্ছা, তোর ইচ্ছে হলে যা। আমিত বলেছি তোর ইচ্ছের উপর আমার আপত্তি নেই। তবে সাবধানে যাস্। ঠাণ্ডা বেশী যেন লাগে না, দিন কাল ভাল না। বুঝলি?"

"আচ্ছা, তা আমায় বলতে হবে না, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। যাই তা হলে, বুঝলে?"

*　　　*　　　*

কমলরঞ্জন চলিয়া গেল। সুখরঞ্জন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে আজ তিন চার বছরের আগেকার কথা, সুখরঞ্জনের পিতা মৃত্যুশয্যায় ছোট পুত্র দুটিকে সুখরঞ্জনের হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"বুকের রক্ত দিয়ে আমি তোকে মানুষ করেছি,

এখন ভাইদের তুই মানুষ করে তুল্‌বি।" সে কথা সুখরঞ্জন ভুলে নাই, নিজের সাধ্যমত ভাইদের শিক্ষা ও স্বচ্ছন্দতার জন্য সে চেষ্টা করিয়াছে। অর্থে যাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, স্নেহ দিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ ও তার মন্দ জুটে নাই। কিন্তু যখন অত্যাচার ও অবিচারে দেশবাসীর মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, আত্মোন্নতির জন্য সকল প্রকার বৈধ উপায়কে শাসকসম্প্রদায় নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইয়া দেশবাসীর মনে সদাপ্রচ্ছন্ন ধূমায়মান অসন্তোষবহ্নিকে পীড়নফুৎকারে প্রোজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল, তখন অনেক ভাবিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও সুখরঞ্জন স্থির থাকিতে পারিল না। কত কথা তার মনে পড়িল। তার ভাইদের শিক্ষাস্বাচ্ছন্দ্যের কথা, জীবনে ভোগ সুখের কথা, কত বিনিদ্র রজনী সে কাটাইল। একবার ভাবে,—আর না, সময় বহিয়া যায়, তাহার আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মনে মনে সে একপদ অগ্রসর হয়, আবার ত্রস্তপদে সে ফিরিয়া আসে। এক পা, আর এক পা, অমনি মনে পড়ে ভাইদের খাওয়াইবে কেমন করিয়া। জীবন তাহার অসহ্য বোধ হইল। দিবানিশি ভগবান্‌কে ডাকিয়াও সে ইহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। এমন সময় চাঁদপুরের নিরন্ন, কঙ্কালসার কুলিদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সপাৎ করিয়া কে যেন সুখরঞ্জনকে এক প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করিল। না আর ত নির্ব্বিকার অবস্থায় বসিয়া থাকা চলে না। 'যা

করেন ভগবান্' বলিয়া সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যে নামিয়া পড়িল। সত্যই ত কে কাহার আহার দেওয়ার মালিক। মানুষ ভ্রান্তজীব, আমি আমি করিয়া অহংকে আরও দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াই মানুষ জীবনে অশান্তিকে ডাকিয়া আনে। তাহাই হউক ভগবান্, তুমি যাহা স্থির করিবে তাহাই হউক, এই ভাবিয়া সুখরঞ্জন চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। কিছুদিন অভাবে অনটনে অথচ মনের শান্তিতে তাহাদের কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু আজ যখন কমলরঞ্জন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া অর্থের অভাবে পাড়ার বড়লোকের সঙ্গে উৎসব দেখিতে বাধা হইল, তখন সেই বুকের এক পাশে পুঞ্জীভূত দুঃখরাশি হঠাৎ বড় ভারি বলিয়া বোধ হইল! মনে পড়িল, কত বাসনা-আকাঙ্ক্ষায় রঙ্গীন করিয়া জীবনটাকে রামধনুর মত বিচিত্র করিয়া তুলিবার কল্পনা তাহার ছিল। কিন্তু কি করিবে, দেশের আহ্বানে তাহাকে সাড়া দিতে ত হইবেই। নহিলে যে সে দেশদ্রোহী হইবে। ভাবিতে ভাবিতে সুখরঞ্জন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।

* * * *

হঠাৎ সুখরঞ্জনের চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া কমলরঞ্জন বেগে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া সুখরঞ্জন বলিয়া উঠিল—"কিরে কমল, গেলিনে যে?" কমলরঞ্জন উত্তর দিল—"না রাঙ্গাদা যাওয়া হল না।"

"কেন রে, কি হল তোর? কেউ কিছু বলেছে নাকি?"

"না, রাঙ্গাদা, কেউ ত কিছু বলে নি।"

"তবে ?"

"তবে কেন যে আমার যেতে ইচ্ছে হল না, তা আমি নিজেই বলতে পারি না।"

"কি ব্যাপার, শুনিই না।"

"শোন রাঙ্গাদা, জীবনে আমার এমন কোন দিন হয় নি। আমি কাপড় চোপড় পরে অনাথদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম, তাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠতে গেলুম এমন সময়ে আমার বুকের মধ্যটা কেমন করে উঠল। এমন আমার কখনো হয় নি। কে যেন মনের ভিতর থেকে মুখ খানা ম্লান করে বলে উঠল—ছিঃ কমল, কোথায় যাস, বুঝতে পারছিস না কারা উৎসব করছে? পেছিয়ে গেলুম, অনাথ এসে হাত ধরে বললে, উঠ না ভাই কমল। আবার উঠতে চেষ্টা করলুম, আবার মনের মধ্যে ঐ কথা বেজে উঠল। আমি ফিরলাম, অনেক সাধ্য সাধনাতেও আর গাড়ীতে উঠতে গেলাম না। মনে হচ্ছে একখানা করুণ মুখ আমার ভিতর গুমরে গুমরে কাঁদছে, সে মুখখানা যেন আমাদের ভারতমাতার। রাঙ্গাদা, তোমার ইচ্ছাই শেষকালে আমাকেও বশ করলে।"

"ভাই কমল, আমার ইচ্ছা তোমায় বশ করেনি। এ ভগবানের ইচ্ছা। জেনো, সব সময়েই মনে রেখো মানুষের নিজের মনের উপরও নিজের হাত নেই। তুমি যে আজ অদ্ভুত অনুভূতির মধ্যে ফিরে এলে, এ সেই লীলাময়ের ইচ্ছায়ই হয়েছে, তোমার আমার

এতে হাত নেই। ভগবানের হাতে ক্রীড়াপুত্তুল আমরা তাঁরই ঈঙ্গিতে আমরা স্বরাজের পথে চলেছি। তাঁরই ইচ্ছায় তোমার মত সকলের মনেই আজ এমনি লীলা চল্‌ছে। আশীর্ব্বাদ করি এই রকম সব সময়ে বিবেকের বাণীর অনুসরণ করো, সেই হচ্ছে মানুষের মনের চিরন্তন লীলা!"

ঠিক সেই সময়ে বাহিরে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল—

সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই গভীর অন্ধকার,
অন্তরে তোর আঁধার কেবল, দুয়ার বন্ধ তার।
কিসের লাগিয়া দীপ জ্বালিস্ রে,
কিসের লাগিয়া সুখে হাসিস্ রে,
উৎসবে তুই কেন মাতিস্ রে,
জননী বক্ষে যে শৃঙ্খল ভার;
মুখ ঢাক ভাই মুখ লুকাও রে
দীপ নিভে যাক্ দীপ নিভাওরে
অন্তরে তোর স্থির জাগাওরে
বিষাদখিন্না মুখখানি মার।
সম্মুখে সেই পশ্চাতে সেই গভীর অন্ধকার,
অন্তরে তোর আঁধার কেবল, দুয়ার বন্ধ তার!

স্বাস্থ্য আনন্দ

:o:

(১)

ডিরিঅন্‌সোনে ঠিক শোন নদীর উপর একখানি ছোট অথচ সুসজ্জিত বাঙ্গলোতে অল্প কয়েকদিন হইল সুশীলকুমারকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আনা হইয়াছে। সুশীলকুমারের মাতৃপিতৃকুলে তেমন আপন বলিবার বড় কেহ ছিল না, আর যাহারাও বা দুই একজন ছিল, তাহাদের কাছে অর্থহীন বিপন্ন আত্মীয়টীর প্রতি স্নেহ-মমতা দেখান একবারে বাজে খরচ বলিয়া মনে হইত। সুতরাং অধিক মাত্রায় পড়িয়া পড়িয়া পুষ্টিকর আহারের অভাবে সুশীলকুমার যখন বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িল, তখন তাহার আশৈশব বন্ধু সরলকুমারের আশ্রয় লওয়া ভিন্ন তাহার অন্য কোনও গতি রহিল না। সরল কুমারের সঙ্গতি যে খুব বেশী ছিল তাহা নয়, তবে তাহার অসহায় প্রতিভাবান্ বন্ধুটীর উপর এমন একটা প্রাণের টান ছিল যাহার জন্য সে সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়াও তাহার চিকিৎসা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। প্রায় তিন চারি মাস কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইয়া সরলকুমার বন্ধুর শুশ্রূষা করিল, কিন্তু সুশীলকুমারের

অসুখ দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। বন্ধুর অবস্থা দেখিয়া সরলকুমার ক্রমেই চিন্তিত হইয়া পড়িতেছিল এবং যেদিন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আসিয়া বলিয়া গেল যে সুশীলকুমারের ক্ষয়রোগ আরম্ভ হইয়াছে, সেদিন বাস্তবিকই সরলকুমারের বুকখানা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। বন্ধুর উপর সরলকুমারের বড় আশা ছিল। নিজে সে বিদ্যামন্দিরে তেমন বেশী কিছু কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই, ইহার জন্য তাহার একটা মস্ত অনুশোচনা ছিল। কিন্তু সে এই বলিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দিয়াছিল যে বন্ধু সুশীলকুমারকে দিয়া সে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবে। তাহার সে আশা প্রায় ফলবতী হইয়াও আসিয়াছিল। সুশীলকুমার গণিতশাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণা বৃত্তি পাইয়াছিল। প্রায় বৎসর কাল সে কতকগুলি নূতন গবেষণা করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে কিছু প্রশংসাও লাভ করিয়াছিল। এমন সময়ে কোথা হইতে এই কাল ব্যাধি আসিয়া জুটিল। তাই সরলকুমার বন্ধুর এই ব্যাধির নাম শুনিয়াই এমন বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িল। তাহার আশা ছিল খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের সিংহাসনে বন্ধুকে বসিতে দেখিয়া সে নয়ন সার্থক করিবে, কত দেশ দেশান্তর হইতে সাধক আসিয়া এই বিজ্ঞানমন্দিরের পূজারিটিকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার ফুলহারে সাজাইয়া দিবে। সে কত বড় একটা রঙ্গীন আশা। সরলকুমারের সে আশাভঙ্গের দারুণ সংবাদরূপে যখন এই ভীষণ ব্যাধির কথা সে প্রথম শুনিল, তখন যে তাহার মনে প্রচণ্ড আঘাত

লাগিবে, সে কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অল্প সময়েই সে কর্ত্তব্যজ্ঞানে বুক বাঁধিয়া লইয়া বন্ধুর শেষ পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করিবার জন্য মন স্থির করিয়া লইল। ক্রমে ক্রমে চিকিৎসকেরা বলিয়া গেলেন সুশীলকুমারের ব্যাধির উপশম করিবার মত ঔষধ তাঁহাদের নাই, তবে যদি স্থান পরিবর্ত্তনের দ্বারা কোনও ফল হয়। তাঁহাদেরই উপদেশে সরলকুমার বন্ধু সুশীলকুমারকে ত্রিনিদ্দিসোনে লইয়া আসিয়াছে। অনেক চেষ্টায় সে সোনের উপর এই বাঙ্গলোটী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। এখন সে তাহার অফিস হইতে তিন মাসের ছুটী লইয়া রুগ্ন বন্ধুর সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

[২]

"ওরে সুশীল আজ কেমন আছিস্ ভাই ?"

অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বাহির হইতে একটু বেড়াইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সরলকুমার বন্ধু সুশীলকুমারকে এই প্রশ্ন করিল। সুশীল ধীরে ধীরে উত্তর দিল—"বেশ ত আছি, আমার জন্য তুই কেন এত কষ্ট করছিস্ ? নিজের অজস্র অর্থ নষ্ট ত করছিস্ই, তার উপর আহার নিদ্রা ত্যাগ করে নিজের শরীরটাও নষ্ট করতে বসেছিস।"

"সুশীল, আবার ও কথা, তোর কি আমার উপর একটুও ভালবাসা নেই ?"

"না, না, সরল, আর ও কথা বল্‌ব না, তুই যে ছেলেমানুষ, এখনি আবার কাঁদতে আরম্ভ করে দিবি।"

ইহার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বেই সুশীলকুমার বন্ধুর এই প্রাণপাত করা সেবা দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ একটা কি যেন বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে সরলকুমার অভিমানে কাঁদিয়া অনাহারে সারাদিন কাটাইয়া দিয়াছিল, তারপর অনেক সাধ্যসাধনায় আর কখনও এইরূপ কথা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিবেনা প্রতিজ্ঞা করিয়া তবে সুশীলকুমার বন্ধুকে আহারে বসাইতে পারিয়াছিল। সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া সুশীলকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। তাই অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল,—"সরল, আমার কথায় রাগ কর্‌লি ভাই? আমি ত ঠিক্ তাই বলছি না। তবে, আমার ত দিন শেষ হয়ে এসেছে, তুই কেন নিজের শরীর ও মন নষ্ট কর্‌তে বসেছিস্?" সরল অভিমান করিয়া উত্তর করিল—"তবে বল্ তুই আমায় পর ভাবিস্।" তাহার চোখ দুটী ছল ছল করিতে লাগিল।

"সরল, তোকে পর ভাবব? সংসারে তুই ছাড়া আমার কে আছে?" এই কথার সহিত সুশীলকুমারের একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস পড়িল।

এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল। অল্পক্ষণ পরে সরলকুমার বলিল—"দেখ সুশীল, আমার এক বন্ধু বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে এসেছে। আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। বেহারা

রইল, প্রয়োজন হ'লেই আমাকে সংবাদ পাঠাস্। আর আমিও আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি, বুঝলি ?" "আচ্ছা"।

সরল চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই সুশীল সম্মুখের বাঙ্গলোটীতে মহিলাকণ্ঠে সঙ্গীত হইতেছে শুনিতে পাইল। মনে হইল অতি করুণকণ্ঠে একটী মহিলা গাহিতেছে—

"সব দিবি কে, সব দিবি পায় !
আয় আয় আয় !
ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়,
আয় আয় আয় !
আসবে সে যে স্বর্ণ-রথে,
জাগবি কারা রিক্তপথে
পৌষ রজনী, তাহার আশায়
আয় আয় আয়।
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা ;
হায় হায় হায়।
তার পরে তার যাবার বেলা ;
হায় হায় হায় !
চলে গেলে জাগ্‌বি যবে
ধন রতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে যে দায় ;
হায় হায় হায়।"

সন্ধ্যার মধুর বাতাসে সেই গানের স্বরলহরী ভাসিয়া ভাসিয়া সুশীলকুমারের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল। এই কণ্ঠস্বর, এই গান গাহিবার ভঙ্গীটী তাহার মনে একটা মধুর স্মৃতি জাগাইয়া দিল—সেই ব্যথা বেদনায় করুণ অথচ মধুর স্মৃতিটুকু যাহা এতদিন ধরিয়া সে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সযত্নে ধরিয়া রাখিয়াছে! এমনি একটী কণ্ঠস্বর, এমনি একটী গানের ভঙ্গী তাহার বড় পরিচিত, বড় প্রিয় ছিল। ঠিক সেই কণ্ঠস্বর, না? কোন্ দুরাগত বাঁশীর মত সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর, যেন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মোহবশে অভিভূত করিয়া ফেলিল। স্বপ্নের মত একটা মোহন আবেশে সুশীলকুমার তন্ময় হইয়া পড়িল। কেবল থাকিয়া থাকিয়া তাহার কানের কাছে একটী পরিচিত সুরে বাজিতে লাগিল—

"ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা,
হায় হায় হায়!
তার পরে তার যাবার বেলা
হায় হায় হায়!"

(৩)

সেই অন্তরের স্মৃতির ধ্যান করিতে করিতে কখন যে সুশীলকুমার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহা সে আদৌ জানিতে পারে নাই। রাত্রি দশটার সময় সরলকুমারের ডাকে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল। নিদ্রা ভাঙ্গিতেই সরল জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যা রে সুশীল, শরীর খারাপ

লাগছে, সন্ধ্যার সময়েই যে ঘুমিয়ে গেছিলি? আমি দু ঘণ্টা বসে বসে দেখলুম, তোর ঘুম ভাঙ্গে কিনা, তারপর রাত্রি দশটা বেজে গেল তবু তোর ঘুম ভাঙ্গলো না দেখে আমি তোকে ওষুধ ও পথ্য খাবার জন্য ডেকে তুললাম। এই নে ওষুধটা খেয়ে ফেল, আর এই দুধ রুটিটুকুও খেয়ে নে, তারপর যত পারিস্ ঘুমো।" সুশীলকুমার বন্ধুর নির্দ্দেশ মত ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করিল, পরে বন্ধুর দিকে তাকাইয়া বলিল—"সরল, তোর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হলো?" সরল উত্তর দিল—"হ্যা রে, বন্ধুর সঙ্গে আলাপ ত হলই, অধিকন্তু বন্ধুপত্নীর একটা গানও শোনা গেল, তুই শুনেছিস্ নাকি, শোনবার ত কথাই, বেশ জোরেই ত গাচ্ছিলেন।" সুশীলকুমার উত্তরে কেবল একটু ছোট করিয়া বলিল—"হাঁ"। সরল বলিতে লাগিল, "যা হোক্, আমাদের এই নির্জ্জন বাসের একজন সঙ্গী জুটল, ভালই হ'ল। তাতে আবার বন্ধুটী ডাক্তার, হাতের কাছে থাকায় বেশ উপকার হবে। বন্ধুর স্ত্রীটীও শুনেছি বেশ গুণবতী, তবে বড় কম কথা কন। কিন্তু আমাদেরই মত নব্যতন্ত্রের, সকলের সঙ্গে মেলা মেশায় বেশ একটা সহজ অচপল ভাব। যাক্ কাল ত আস্‌ছেন সন্ধ্যার সময়ে, তোর সঙ্গে আলাপ করে খুব খুসী হবে তারা।" "সরল, তোর বন্ধুটীর নাম বললি না?" "হ্যা, নাম হচ্ছে মনুজনাথ, মেডিক্যাল কলেজের এম, বি।" এই কথা শুনিয়া সুশীলকুমার চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্তার? নাম মনুজনাথ? তোর বন্ধুর স্ত্রীর নাম জানিস্?"

সরল উত্তর করিল—"হ্যা, শুনলুম যে, দাঁড়া মনে করি। হয়েছে, তার নাম হচ্ছে সুষমা।" নাম শুনিয়া সুশীলকুমার যেন কেমন একরকম বিচলিত হইয়া পড়িল। সরল তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল—"সুশীল, শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে ?" "হাঁ, একটু যেন খারাপ লাগছে ?" "তবে থাক্, আজ আর গল্প করে না, ঘুমো।" এই বলিয়া সরলকুমার নিজ শয্যায় শয়ন করিতে গেল। আসলে সুশীলের শরীর পূর্ব্বের অপেক্ষা খারাপ বোধ হয় নাই, সুষমার নাম শুনিতেই সে এতদূর চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল যে বন্ধুর নিকট হইতে সে চাঞ্চল্য লুকাইবার জন্যই সে এই মিথ্যার আশ্রয় লইল। সুশীলকুমার শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগল,—ডাক্তার মনুজনাথের স্ত্রীর, নাম সুষমা! তবে কি সেই সুষমা ? তাহার স্বামীর নামও ত মনুজনাথ, আর সেও ত ডাক্তার! কণ্ঠস্বরও ত সুষমারই মতন। তবে কি আবার দেখা হইবে ? বিদায়ের দিনে সেই যে মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহা এখন যৌবনের সৌষ্ঠবে বসন্তের নবমঞ্জরীশোভিত লতাটীর মত কি শোভাই না ধারণ করিয়াছে! যাহা হউক মনকে এত উতলা হইতে দেওয়া হইবে না। জীবনের শেষ কয়টা দিন বুক বাঁধিয়া অদৃষ্টের হাতে আপনাকে সঁপিয়া দিব। এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে প্রায় শেষ রাত্রিতে সুশীলকুমার অবসন্ন মনে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(৪)

দিবা দ্বিপ্রহরে বাহিরে রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে। সুশীলকুমারের শয়ন কক্ষের একটী বাতায়ন তখনও উন্মুক্ত রহিয়াছে! সেই বাতায়ন দিয়া সুশীলকুমার শুইয়া শুইয়া সম্মুখের শোন নদের বালুকাময় বুকের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। আজ বুঝি তাহার ভাবনার শেষ নাই। প্রথম জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে কত দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বড় হইতে হইয়াছে। অর্থ দিয়া যে সুখ, জীবনে সে সুখের মুখ সে কখনও দেখে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবার পর যখন সে অধ্যাপক পদে বৃত হইয়াছিল, তখন সবে সে দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া সুখের মুখ দেখিবে বলিয়া আশা করিতেছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে এই কাল ব্যাধি আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। শৈশব হইতেই তাহার কত উচ্চ-আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভবিষ্যতের কত আশা কত বাসনায় রঙীন করিয়া জীবনটাকে ইন্দ্রধনুর মত নানা বর্ণে রঞ্জিত করিবার তাহার সংকল্প ছিল। এখন সে সকল স্বপ্নের মত মনে হইতেছে। সকলের ধারণা অধিক পড়াশুনা করিয়া শরীরের অযত্ন করায় তাহার এ দারুণ ব্যাধি দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহারা ত এ কথা জানেনা যে আজ বৎসরাধিক কাল হইল তাহার মর্ম্মের মাঝখানে যে ভীষণ একটা আঘাত প্রতিদিন তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তাহার যন্ত্রণার

তুলনায় এ ব্যাধির যাতনা কিছুই নহে। মনের সেই পীড়া হইতেই বোধ হয় তাহার দেহের এই পীড়ার সৃষ্টি। এক বৎসর সে গবেষণার কঠিন পরিশ্রমে মনকে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মন যখন তাহার একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, তখন দেহও তাহার আর টিকিল না। সুশীলকুমার শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল—ওই যে সম্মুখে কঠিন বালুর স্তূপ, উহার মতই বুঝি আমার হৃদয় কঠিন বালুকাময় হইয়া পড়িয়াছে। ওই দিগন্তপ্রসারী শোনের বক্ষ, একদম শুষ্ক, হয়ত বা অনেক সন্ধানে অল্প একটু জলের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। আমারও ত আজ এমনই দশা, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি একটা প্রচণ্ড স্তূপে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাই আজ হৃদয় আমার জলহীন মরুভূমির মত, হয়ত অনেক খুঁজিলে অল্প একটু মায়া-মমতার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সে আজ মরুভূমির মরীচিকার মত। আমার এ দশা কেন হইল? এমন একদিন ছিল যেদিন হৃদয় আমার কত বর্ণের সুগন্ধি ফুলে সদাই হাসিত, এবং সেই ফুলগুলির মধ্যে গোলাপ হইয়া ফুটিয়াছিল এক লজ্জারুণা কিশোরীর অনাবিল প্রেম। যেমন তাহার নামটী ছিল সুষমা, তাহার অঙ্গভঙ্গী, তাহার কথার ধরণ, তাহার হাসি, গান সবই তেমন আমার হৃদয়ে এক স্বর্গীয় সুষমা আনিয়া দিত। সে কি সুখ? সে কি সঞ্জীবনী শক্তি? যখনই দারিদ্র্যের ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িতাম তখনই সুষমার সেই সঞ্জীবনী শক্তি আমার সব ব্যথা জুড়াইয়া দিয়া যাইত। তারপর যখন অর্থের মুখ দেখিতে আরম্ভ

করিলাম, তখন মনে হইল যেন আমার হৃদয়-শতদল তাহার দলগুলি বিছাইয়া আমার জীবনলক্ষ্মীর বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দিতেছে। তারপর হঠাৎ একদিন সব আশা শূন্যে মিলাইল। হঠাৎ একনিশ্বাসে এতদিনের স্বপ্নরাজ্য ভাঙ্গিয়া ছারখার হইয়া গেল। তারপর একদিন মাত্র সুষমার নিকট বিদায় লইতে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছি তাহার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু আমার ভাঙ্গা বুক আর জোড়া লাগিল কই? কাহার অভিশাপে আমার এ জন্ম ব্যর্থ হইয়া গেল? জীবনে ত কাহারও অপকার করি নাই, তবে আমার এ অপকার কে সাধিত করিল? শৈশবে গল্প শুনিয়াছি কোন্ এক বিদ্যাধর স্বর্গের এক অপ্সরীর অযাচিত প্রেম উপেক্ষা করায় এই বলিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, যেমন তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই, তেমনই তাঁহাকে পৃথিবীতে বালুকাময় নদরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, সেই বিদ্যাধরই কি এখন শোননদে পরিণত হইয়াছেন। আমি ত কখনও প্রেমের উপেক্ষা করি নাই; যে একমাত্র প্রেম আমার জীবনে দেখা দিয়াছিল, তাহাকে ত আমি বরণ করিয়াই লইয়াছিলাম। তবে আজ আমার এ দশা কেন?

এইরূপ নানা ভাবনা আজ সুশীলকুমারের অবসন্ন মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। সে-বেহারাকে ডাকিয়া সম্মুখের বাতায়নটী বন্ধ করাইয়া দিল, তারপর শুইয়া শুইয়া ছটফট করিতে করিতে একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

(৫)

সন্ধ্যার বাতি জ্বলিবার অল্পক্ষণ পরেই সরলকুমার আসিয়া ডাক দিল, "সুশীল, দেখ চেয়ে আমার বন্ধু ডাক্তার মন্মুজনাথ আর তার স্ত্রী এসেছেন।" সুশীল চাহিয়া দেখিল, দেখিয়া চক্ষুর পলক ফেলিতে পারিল না, দেখিল তাহারই সুষমা, তাহার ধ্যানের একমাত্র প্রতিমা সুষমা আজ পরের স্ত্রীরূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত; কিশোরী আজ নববধূতে রূপান্তরিত, তাই তাহার সরলতাও গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে। প্রথম দর্শনেই সুশীলকুমার বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে বুক বাঁধিয়া লইল। সুষমারও ঠিক সেই অবস্থা হইল, পূর্ব্বদিন সরলকুমারের নিকট সে সুশীলকুমারের সম্বন্ধে সকল কথাই শুনিয়াছিল, শুনিয়া বুঝিয়াছিল তাহার কৈশোরের প্রিয়তম বন্ধু আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তাই সে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল যতদিন তাহারা ডিরিঅন্সোনে থাকিবে প্রিয়বন্ধুর শেষের কয়টা দিন যাহাতে সুখে কাটে তাহার চেষ্টা করিবে। কিন্তু চক্ষুর সম্মুখে তাহার প্রিয়তম বন্ধুর এই অবস্থা দেখিয়া সুষমা প্রথমে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক সুষমা অল্পক্ষণেই যে ভাঙ্গা বুককে এতদিন দৃঢ় ভাবে বাঁধিয়া আসিয়াছে, তাহাকে আরও দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া লইল। সুশীলকুমার ও সুষমার এই চাঞ্চল্য তাহাদের দুইজনের চক্ষুর ভাষায় পরস্পরের

নিকট প্রকাশ পাইল বটে, কিন্তু মনুজনাথ বা সরলকুমারের নিকট তাহা ধরা পড়ে নাই। তারপর যখন পরিচয় করানোর পালা সুরু হইল, তখন সরলকুমার সুশীলের নিকট সুষমাকে পরিচিত করিয়া দিতে গেলে তাহাদের দুজনের চক্ষুতেই একটা বেদনাময় হাসির ইসারা খেলিয়া গেল। অনেকক্ষণ কথাবর্ত্তার পর বোধ হইল যেন সুশীলকুমার ও সুষমার মধ্যে আজ নূতন আনন্দের ঢেউ খেলিতেছে, তাহারা বেশ হাসিয়া হাসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। বিবাহের পর মনুজনাথ সুষমাকে কখনও এমন পূর্ণ আনন্দের মূর্ত্তিতে দেখে নাই, সরলও সুশীলকে আজ এক বৎসর হাসিতে দেখে নাই। তাই তাহাদের এই তরল হাসি দেখিয়া মনুজনাথ ও সরলকুমার বড়ই আনন্দিত হইল। কথায় কথায় সরলকুমার সুষমাকে একটা গান গাহিতে বলিলে সে মোটেই আপত্তি না করিয়া গাহিতে লাগিল—

"সহসা ডালপালা তোর উতলা যে।
ও চাঁপা, ও করবী;
কারে তুই দেখ্‌তে পেলি
আকাশ মাঝে জানিনা যে।
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
ও চাঁপা, ও করবী,
কার নাচনের নূপুর বাজে জানিনা যে।

তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান তোমার মনে জাগে?
কোন্ রঙের মাতন উঠ্‌ল দুলে
ফুলে ফুলে, ও চাঁপা, ও করবী,
কে সাজালে রঙীন সাজে জানিনা যে।"

গান গাওয়া শেষ হইলেই সুষমা সুশীলকুমারের চোখে চোখে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। তারপর হঠাৎ স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "রাত হয়েছে চল বাড়ী যাই, ওঁকে এখন ঘুমুতে দেওয়া আবশ্যক।" ইতিমধ্যে মঞ্জুজনাথ ও সুশীলকুমারের মধ্যে বেশ আলাপ জমিয়া গিয়াছিল। উভয়েরই পরস্পরকে বেশ ভাল লাগিয়াছিল। তাই সুষমার কথায় মঞ্জুজনাথ সুশীলকুমারের নিকট বিদায় লইবার সময়ে ছলছল চোখে আবার পরের দিন আসিবে বলিয়া কথা দিয়া গেল।

(৬)

সে রাত্রে সুশীলকুমারের নিদ্রা হইল না। তাহার কানের কাছে একটী মধুর সুরে কেবল বাজিতে লাগিল—

"সহসা ডাল পালা তোর উতলা যে!
ও চাঁপা, ও করবী!
কারে তুই দেখ্‌তে পেলি
আকাশ মাঝে জানি না যে!"

সুশীলকুমারের মনে হইতেছিল যেন সুরপুর হইতে কোন্ এক সুরের ধারা আসিয়া তাহার হৃদয়ে হিল্লোল তুলিয়া দিয়া গেল। তাহারও যেন হৃদয়ের জীর্ণ দলগুলি ঝরিয়া খসিয়া পড়িয়া হঠাৎ নূতন মঞ্জরীর শোভা বিকাশ করিল! আজ তাই বসন্তের আগমনে চাঁপা ও করবীর মত তাহারও মনের ডালপালাগুলি উতলা হইয়া উঠিল। মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও আজ তাহার চিরপরিচিতাকে দেখিয়া সে যেন আপনাকে সামলাইয়া লইতে পারিতেছিল না। এই হঠাৎ দেখাদেখির মাঝখানে এমন একটা আবেশময় সুরের সৃষ্টি হইল, যাহা কেবলই তাহার প্রাণে ঝঙ্কার দিয়া কোন্ এক মিলন-কুঞ্জের নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছিল - "সখি, যাই, যাই, যাই।" বেহারাকে ডাকিয়া সুশীলকুমার ঘরের বাতায়নগুলি খুলিয়া দিতে আদেশ করিল। বাতায়নগুলি খুলিবামাত্র বাহিরের জোৎস্নার ধারা ফিনকি দিয়া ঘরখানিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল আজ পূর্ণিমার রাত্রি, বাহিরের পূর্ণচন্দ্র যেন সুশীলকুমারের হৃদয়-নিহিত প্রেমচন্দ্রের সহিত কোলাকুলি করিয়া গেল। আজ তাহার প্রাণের মাঝে যেরূপের খেলা চলিতেছিল, প্রকৃতির বুকে তাহারই যেন প্রতিচ্ছবি ; তাহার অন্তরের সে ঝঙ্কার, সে সুরসমস্ত যেন প্রকৃতির জ্যোৎস্নার হিল্লোলের সঙ্গে মিশিয়া একটা রূপকের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুশীল-কুমার ভাবিল হয়ত বা ভবিষ্যৎ কল্পলোকের একটা মোহন রূপ তাহার হৃদয়ে ফুটি ফুটি করিতেছে এবং সেই রূপের ফাঁকে ফাঁকে ভবিষ্যতের এক চিরাকাঙ্ক্ষিত মিলনের ছবি দেখাইতেছে, না তাহার

আশে পাশে সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যেন একটা রূপকের রাজ্য সৃষ্টি হই তেছে ; যেন সে এক বিরহী, যুগ যুগ ধরিয়া এক লজ্জারুণা কিশোরীর মূর্ত্তিধ্যানে বসিয়া আছে, এইবার বুঝি মিলনের দিন আসিয়া দেখা দিবে,সেই ভবিষ্যৎ সুখসম্ভাবনার অগ্রদূত রূপেই বুঝি বাহিরের এ জ্যোৎস্না তাহার প্রাণের মাঝে পশিয়া একটা নাড়া দিয়া বলিয়া গেল— "বিরহী, জাগো জাগো।" সুশীলকুমার বাতায়নের বাহিরে চাহিয়া দেখিল, বাহিরের চাঁদ সঙ্গিনী তারার পাশে বসিয়া প্রেম-বিহ্বল প্রাণে সঙ্গিনীদের গায়ে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, আর তাহারা মুচকি হাসিয়া প্রিয়তমের আলিঙ্গনের কবল হইতে সরিয়া যাইতেছে, সারা আকাশ জুড়িয়া, সারারাত ধরিয়া যেন তাহাদের প্রেমের এই লুকাচুরি খেলা। সুশীলকুমার ভাবিতেছিল—"তাহার জীবনেরও কয়টা বছর এমনি প্রেমের লুকাচুরি খেলায় সুখেই কাটিয়াছিল, তারপর নিষ্ঠুর বিধাতার নিকট হইতে এই খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার হুকুম আসিল। সে হুকুম সে পালন করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে তাহাকে হারাইতে হইয়াছিল তাহার জীবনের সকল সুখ, প্রাণের সব কয়টা আশার মঞ্জরী। সুষমার নিকট যে দিন সে শেষ বিদায় লইতে গিয়াছিল, সে দিন সুষমা সুশীলকুমারকে বলিয়াছিল—"কেন এত কষ্ট কচ্ছ? আমাদের মিলন যে চিরন্তন, সে মিলন জন্ম-জন্মান্তরেও অটুট থাকবে। তবে কেন মনে কর না, তুমি আমায় এ জীবনে অন্যকেই দান করলে? পরজন্ম থেকে যেন তোমার সেবারই অধিকার পাই এ আশীর্ব্বাদ করে যাও।" সুষমার

সেই বিদায়বাণী আজ সুশীলকুমারের মনে পড়িতেছিল। সে ভাবিতেছিল প্রেম কেন এমন সঙ্গলিপ্সার জন্য ব্যাকুল হয়। বাস্তবিক সেই কি প্রেম? বোধ হয় নয়, প্রেম তখনই শাশ্বত হইয়া উঠে যখন আসঙ্গলিপ্সার হিংসা, দ্বেষ, ব্যথা, বেদনা সব দূরে যায়। সুশীলকুমার আজ প্রেমের সেই রূপটাকেই ধরিতে পারিতেছিল। বাহিরে আকাশের চাঁদ ও তারারা হাসিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতে যাইতে সুশীলকুমারের দিকে চাহিয়া বলিতেছিল,—"দেখ আমাদের মিলন কেমন শাশ্বত, আমাদের প্রেম কেমন চিরন্তন। কেন জানো? ইহার মধ্যে কামনার কলুষ নাই। আসঙ্গের আবিলতা নাই। তাই তোমাদের প্রেম ভঙ্গুর, আমাদের প্রেম শাশ্বত।" সুশীলকুমার প্রকৃতির রাজ্যের এই আনন্দের ফোয়ারা উপভোগ করিতে করিতে একরকম জাগিয়া থাকিয়াই সে রাত্রি কাটাইয়া দিল।

(৭)

সুষমা ও মঞ্জুজনাথ প্রত্যহ দুইবেলা সুশীলকুমারকে দেখিতে আসিত। সুষমা এখন বুক বাঁধিয়াছে, সে যে কয়টা দিন এখানে থাকিবে, সুশীলকুমারের রোগ-ক্লিষ্ট দিনগুলি আনন্দময় করিয়া তুলিবার সংকল্প করিয়াছে। তাই সে অযাচিত হাসি ও গানে সুশীলকুমারকে মাতাইয়া রাখে। ক্রমে যেন সুশীলকুমারের অবস্থা একটু ভাল দেখা গেল, আনন্দের আবেগেই হউক অথবা যে কারণেই

হউক আজকাল তাহার আর সন্ধ্যার সময় জ্বর আইসে না, দেখিয়া সুষমা, মনুজনাথ, সরলকুমার সকলেই বিশেষ আহ্লাদিত হইল। একদিন সন্ধ্যায় মনুজনাথ সুশীলকুমারকে পরীক্ষা করিয়া বলিল—"দেখ সুষমা, সুশীল বাবুর অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছে, তোমার হাসি ও গানেই উনি সেরে উঠবেন। তুমি থাকলে আর ডাক্তারের কোনও প্রয়োজন নেই!" কথাটা শুনিয়া প্রথমে সুশীলকুমার ও সুষমার কাণের ডগা পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র; সুশীলকুমার আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মনুজনাথকে ঠাট্টা করিয়া ব'লল—"হাঁ মনুজবাবু, আপনার পশারের আর ভাবনা কি? সস্ত্রীক রোগীর কাছে গেলেই রোগী সেরে উঠবে, ওষুধও লাগবে না।" সুষমা সুশীলকুমারের দিকে তাকাইয়া একটী কৃত্রিম কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। সরলকুমার ও মনুজনাথ কিন্তু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুষমা একটু অভিমানের সুরে বলিল—"যাও, তাহলে আর আমি হাসি গল্প করব না।" মনুজনাথ তখনই বলিয়া উঠিল—"না, না, ও সব বন্ধ করো না। একেই এতদিন গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলে, যদিই বা সুশীলবাবুর কৃপায় তোমার মুখে হাসি, গান ফুটে উঠল, তাও যদি বন্ধ কর, তা'হলে তোমাকে এতগুলি লোককে কষ্ট দেওয়ার জন্য পাপের ভাগী হতে হবে।" এইবার সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সুষমাও সে হাসিতে যোগ দিল। অল্প ক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিল, তারপর সরলকুমার সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ মনুজ, দেখ সুশীল, সেদিন একটা

ভারী মজার ব্যাপার দেখেছি। ষ্টেশনের কাছে যে বস্তী আছে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, দেখলাম পুরুষেরা বসে বসে গল্প গুজব করছে আর স্ত্রীরা মাথায় করে জিনিষ ফিরি করে রোজগার করছে এবং তাই দিয়ে স্বামী পুত্র ও নিজের আহার যোগাচ্ছে। দেখে ব্যাপারটা একটু নূতন বলে বোধ হলো, একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করলুম, "হ্যা রে তোদের পুরুষরা ফিরি করে না?" সে উত্তর করলে—"বাবু, ওরা এসব পারবে কেন? ওরা যে পুরুষ মানুষ।" পুরুষ মানুষের উপর স্ত্রীর এমন বেচারী ভাব নূতন বটে। এ হলো তাদের প্রেমের একদিক। তারপর সন্ধ্যার সময়ে দেখি সেই স্ত্রীলোকটীকে তার স্বামী তাড়ি খেয়ে বেশ প্রহার দিচ্ছে। পুরুষটীকে ধমকাতে গেলুম স্ত্রীটী হাত জোড় করে নিকটে এসে বল্লে—"বাবু ওকে বকবেন না, ওর কি এখন জ্ঞান আছে।" বাস, প্রেমের কি গভীরতা, এ হলো তাদের প্রেমের আর একদিক। এই অদ্ভুত প্রেমের পরিচয় পেয়ে আমার প্রেম জিনিষটার উপর ভয় জন্মে গেছে।" সরলকুমারের বলিবার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল, কিন্তু প্রেমের নামে এই হাসিতে সুশীলকুমার ও সুষমা তেমন যোগ দিতে পারিল না। এই রকমে কয়েক দিন বেশ আনন্দে সুশীলের সময় কাটিতেছিল।

(৮)

হঠাৎ মঞ্জুনাথের চাকুরিস্থল হইতে ডাক আসিয়াছে। সরকারী

চাকরীতে তাহাকে দুই এক দিনের মধ্যেই এলাহাবাদে যাইতে হইবে। এখনই না গেলে চাকরীটী টিকিবে না। মনুজনাথ মৃত্যু-শয্যাশায়ী সুশীলকুমারের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে বলিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িল। সুষমার ত কথাই নাই, তাহার মুখের হাসিটী আবার পূর্ব্বের মত মিলাইয়া গিয়াছে। কোনও কাজে আর তাহার তেমন ফূর্ত্তি নাই, এ কয়দিনের আনন্দ তাহার কাছে যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। সন্ধ্যার সময়ে মনুজনাথ সুষমাকে বলিল—"কাল সকালে আমি এলাহাবাদ যাবার সব বন্দোবস্ত করব, তুমি এই অবসরে সুশীলবাবুদের কাছে বিদায় নিয়ে এসো। কালই ত এলাহাবাদ যেতে হবে। সুষমা একটু ছোট করিয়া 'আচ্ছা' বলিয়া নিজের শয়ন ঘরে চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া সে মনটাকে অনেকটা হালকা করিয়া লইল।

পরদিন সকালবেলা সুষমা একাই সুশীলকুমারের শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। অনেক কষ্টে মনের আবেগ দমন করিয়া সে সুশীলকুমারের পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"আমাদের আজই এলাহাবাদ যেতে হবে।" অন্তরের কান্না আসিয়া তাহার কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল, কিন্তু সে জোর করিয়া বলিল—"আর বোধ হয় দেখা হবে না।" এবার সুষমা আপনাকে সামলাইতে পারিল না, তাহার চক্ষু হইতে দুই চারি ফোটা তপ্তঅশ্রু গড়াইয়া সুশীলকুমারের পায়ে আসিয়া পড়িল। সুষমা নত হইয়া আপনার মুক্ত অলক দিয়া তাহার পায়ের সেই অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া

দিল। সুশীলকুমার ইতিমধ্যে মনকে বাঁধিয়া লইয়াছিল, সে বলিল —"ছিঃ সুষমা, এত দুর্ব্বল তুমি? একদিন আমাকে দুর্ব্বল বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলে, আর আজ তোমার এ দুর্ব্বলতা শোভা পায় না।" সুষমা একটু লজ্জিত হইয়া উত্তর করিল—"না, মনকে বাঁধিয়া লইব, তোমার উপদেশের অমর্য্যাদা করিব না।" সুষমা সুশীলকুমারকে একটা ছোট প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

অসহযোগী

—:০:—

এক

কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একখানি ছোট বাড়ীর একতলার ঘরে দুপুর রাত্রেও মিট মিট করিয়া একটী হারিকেন বাতি জ্বলিতেছিল। বাড়ীর একতলায় এই একটীমাত্র শয়নের ঘর। ঘরটী ছোট, আসবাবপত্র তেমন কিছু নাই বলিলেই চলে। একটী তাকে কয়েকখানি বই ও খাতা, একটী দোয়াত আর দুটী কলম; একখানি অর্দ্ধভগ্ন খাট, পাশে একটী কেরোসিন কাঠের টেবিল আর ছোট একটী চেয়ার। ঘরের এইমাত্র সামগ্রী। টেবিলের উপর কয়েকটী ওষুধের শিশি, আধখানা কমলালেবু, আর ছোট পেয়ালার এক পেয়ালা জল। টেবিলের এক পাশে হারকেনটী রাখা হইয়াছে। ঘরটীর আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম দেখিলেই মনে হয়, ঘরখানি একজন দরিদ্র রুগ্ন মানুষের আবাসস্থল! তখন শীত পড়িয়া আসিয়াছে, ঘরের জানালাগুলি সবই বন্ধ। সুতরাং ঘরটিতে বাতাস প্রবেশের তত পথ না থাকিলেও, এখন তাহাতে বড় অসুবিধা নাই। খাটে মশারি ফেলা, তবে মশারিটীর এমনই দুরবস্থা যে চারিপাশের দরজা জানালা দিয়া শত্রুর প্রবেশের অবাধ পথ রহিয়াছে।

অসহযোগী

খাটের উপর জীর্ণ শয্যায় আধশয়ান অবস্থায় সুখেন্দু করিকাটের দিকে চাহিয়া একমনে কি ভাবিতেছে। অল্প কয়েকদিন হইল অসুস্থ হইয়া সে এখানে আসিয়াছে। বাড়ীটী তাহার বন্ধু সমরনাথের, সে কলিকাতায় সমান্য স্কুল মাষ্টারী চাকরী করে। বাড়ীতে শয়নের উপযুক্ত সবশুদ্ধ দুইটী ঘর, একটী দ্বিতলে, একটী একতলায়। দোতলার ঘরখানিতে সুখেন্দুর বন্ধু সস্ত্রীক একটী শিশুসন্তান লইয়া শয়ন করে। নিম্নের ঘরটী এতদিন খালি ছিল, কদাচিৎ কোনও লোক আসিলে এই ঘরে বসিত। কিন্তু সুখেন্দু আসিবার পর হইতে সে রাত্রি দিন এই ঘরখানি দখল করিয়া আছে। সুখেন্দুর বন্ধুটী দরিদ্র হইলেও বন্ধুকে সাধ্যমত আদর যত্ন করিতেছে। বন্ধু সমরনাথ দিনের বেলায় স্কুলে বাহির হইলে, তাহার পত্নী ছেলেটী লইয়া সুখেন্দুর কাছে আসিয়া বসে, কত গল্প করে, অসুখের ঔষধ পথ্য ঠিক করিয়া দেয়, সুখেন্দুর শৈশবের গল্প শুনে, আর ছেলেকে শিখাইয়া দেয় সে যেন কাকাবাবুর নিকট কেবলি একটী টুকটুকে কাকীমা পাইবার বায়না ধরে। এমনি করিয়া গরীবের অনাবিল যত্নে ও আদরে সুখেন্দুর অসুখের দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

সুখেন্দু ছেলেবেলা হইতেই পিতৃমাতৃহীন, তাহার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়, ইহার মাস ছয়েক পরেই তাহার মাতা পতিশোকে কাতরা হইয়া পুত্রকে অনাথ অবস্থায় ফেলিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। সেই হইতেই সুখেন্দু সংসারে স্নেহের মুখ বড় দেখে নাই। এক ধনী আত্মীয়ের অনাদৃত দানে

তাহার আহারের ব্যবস্থা ও পড়াশুনার খরচ চলিয়া যাইত বটে, কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিতে লজ্জায় ঘৃণায় তাহার মাথা কাটা যাইত। বাড়ীর কুকুরকে দেওয়ার মতন ধনী আত্মীয়ের এই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করা অনুক্ষণ সে বাঁচিয়া থাকাকে ধিক্কার দেওয়া বলিয়াই মনে করিত। ছেলেবেলা হইতেই সুখেন্দুর একটা তীব্র স্বাধীন প্রকৃতি ছিল, যাহার প্রেরণায় সে ধন ও পদগর্ব্বের বিরুদ্ধে সদর্পে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারিত। যাহা হউক, ধনীর এই লাঞ্ছিত দান সুখেন্দুকে অধিকদিন লইতে হইল না। সুখেন্দুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ মেধাই তাহাকে এই হীন অবস্থা হইতে মুক্তি দান করিল। ষোল বৎসর বয়সে সুখেন্দু গ্রাম্য-স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়া মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইল। সেই বৃত্তি সম্বল করিয়া সুখেন্দু কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইল। সেখানে অধ্যাপকদিগের সুপারিশে সুখেন্দু বিনা বেতনে প্রেসিডেন্সিকলেজে পড়িবার অনুমতি পাইল। সুখেন্দুর বিদ্যাবুদ্ধি ও সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ইডেন হিন্দুহোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার উপর তাঁহার পুত্রের পড়াইবার ভার দিয়াছিলেন এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ তাহাকে মাসিক পনের টাকা দিতেন। বৃত্তির কুড়ি টাকা আর ছেলে পড়ানোর পনের টাকা—এই পঁয়ত্রিশ টাকায় সুখেন্দুর দিন বেশ চলিয়া যাইত, দুই এক টাকা মাসে মাসে জমাইয়া ভাল ভাল বই কিনিয়া পড়িবারও তাহার সংস্থান হইয়াছিল। ধনী আত্মীয়ের

সাহায্য আর তাহাকে লইতে হয় নাই। এই হিন্দুহোষ্টেলেই সুখেন্দুর সমরনাথের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। একই শ্রেণীর ছাত্র, দুজনেই মাতৃহীন, তবে সমরনাথের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, ঢাকায় চাকরী করিয়া একমাত্র পুত্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইতেন, আর সুখেন্দুর ত পিতাও নাই। দুজনের মধ্যে আলাপ পরিচয় হইতে সমবেদনা জন্মিল, সেই সমবেদনাই দুজনকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। দুই জনেই একত্র পড়াশুনা করিত, সমরনাথ তত মেধাবী নয় বলিয়া ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বেশী উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিল না। সুখেন্দু তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির গুণে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সব শুদ্ধ চল্লিশ টাকা বৃত্তি লাভ করিল। সুতরাং পড়াশুনার খরচের ভাবনার হাত হইতে এবারও সে অব্যাহতি পাইল। এই সময়ে সমরনাথের পিতা সাধ করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন। সুখেন্দু এই বাল্য বিবাহের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল, কিন্তু সমরনাথের পিতার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া সুখেন্দু আর কিছু বলিল না। ইহার পর সমরনাথ বেশী দিন আর পড়িবার সুযোগ পাইল না। বি, এ পাশের ফল বাহির হইবার পরেই সংবাদ আসিল সমরনাথের পিতা হঠাৎ বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া এক দিনেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। সমরনাথ বি, এ পাশ করিল বটে কিন্তু তেমন ভাল পাশ করিতে পারে নাই। আর অধিক পড়াশুনা করিবারও তাহার সংস্থান হইল না। ইহার উপর সে দরিদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে, সুতরাং স্ত্রীর খরচও তাহাকে যোগাইতে হইবে।

কাজেই কলিকাতায় একটী স্কুল মাষ্টারী জুটাইয়া লইয়া সমরনাথ এই ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়াছে। সেখানে তাহার স্ত্রীকেও লইয়া আসিয়াছে এবং একরকম সুখদুঃখে তাহার সংসার চলিয়া যাইতেছে। সুখেন্দু বিএতেও উচ্চস্থান লাভ করিল, কাজেই বৃত্তির টাকায় তাহার এম্ এ পড়ার খরচ ও অন্যান্য ব্যয়ের সংকুলান হইল ; সুখেন্দু প্রায়ই বন্ধুর গৃহে গিয়া বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সহিত আমোদ আহ্লাদ হাসি গল্প করিত, সুতরাং তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। ক্রমে সুখেন্দু এম্ এ পাশ করিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সে প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণা বৃত্তি পাইল, সেখানে গণিতশাস্ত্রে গবেষণায় কৃতিত্ব দেখাইয়া অধ্যাপকদিগের সে বিশেষ প্রিয় হইল এবং অল্পদিনের মধ্যে অধ্যাপকপদ লাভ করিল। এই উপলক্ষে বন্ধু সমরনাথের গৃহে প্রীতিভোজনের ধূম পড়িয়া গিয়াছিল।

কিন্তু সুখেন্দুর অদৃষ্টে এতটা সুখ সহিল না। সমরনাথ মনে করিয়াছিল বুঝি এইবার সুখেন্দু সুখের মুখ দেখিতে পাইবে। ইতিমধ্যে সমরনাথের স্ত্রী সুখেন্দুর বিবাহের জন্য কনে স্থির করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সুখেন্দুর একান্ত অনিচ্ছায় এবং সমরনাথের ঔদাসীন্যে তাহাকে হতাশ হইয়া নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময়ে অদৃষ্ট সুখেন্দুকে টানিয়া লইয়া গেল আর এক পথে। সে বৎসর পঞ্জাবের অত্যাচার ও অবিচারে যখন সারা ভারত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, যখন আত্মোন্নতির জন্য দেশবাসীর সকলপ্রকার বৈধ

উপায়কে শাসকসম্প্রদায় নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইয়া দেশবাসীর মনে সদাপ্রচ্ছন্ন ধূমায়মান অসন্তোষবহ্নিকে পীড়নফুৎকারে প্রোজ্জ্বলিত করিয়া তুলিলেন, তখন অনেক ভাবিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও সুখেন্দু আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। কত কথা তার মনে পড়িল। শিক্ষা বিভাগে তাহার বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা, জীবনে ভোগসুখের বাসনা, কত কথাই না ভাবিয়া সে বিনিদ্র রজনী কাটাইতে লাগিল। এমন সময়ে চাঁদপুরের নিরন্ন, কঙ্কালসার কুলিদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কে যেন সুখেন্দুকে মর্ম্মের মাঝখানে এক তীব্র বেত্রাঘাত করিল, সে সেইদিনই কর্ম্মত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কংগ্রেসের কার্য্যে নামিয়াই সুখেন্দু ঢাকায় চলিয়া গেল, সেখানে গিয়া সে মুন্সীগঞ্জের জাতীয় বিদ্যালয় ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির ভার গ্রহণ করিল। বাঙ্গালীর তখন প্রচুর উৎসাহ, তাহার উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তখন উজান বাহিয়া চলিয়াছে। মুন্সীগঞ্জের বিদ্যালয় ও কংগ্রেসের কার্য্যে সুখেন্দু প্রত্যেক গৃহস্থ এমন কি কৃষক শ্রেণীর লোকেদের নিকট হইতেও অল্প অর্থ ও প্রতিদিন মুষ্টিভিক্ষা পাইতে লাগিল। এমনি করিয়া একটা অবাধগতিতে সুখেন্দু আটমাস কংগ্রেসের কার্য্য করিল, কংগ্রেসের কার্য্যে কিছু সাফল্য লাভ করিয়া সে আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে চৌরীচৌরার হত্যাকাণ্ডে বিরক্ত হইয়া মহাত্মা

গান্ধী প্রমুখ দেশনেতৃগণ সকলপ্রকার বিরোধের কার্য্য কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা হইতে উঠাইয়া দিলেন। বাঙ্গালী চিরদিনই বিরোধের কার্য্য ভালবাসে, উদ্দাম উচ্ছ্বাসের বশে সে চালিত হয়, স্থিরচিত্তে কাজ করিবার মত মনোভাব কোনও দিনই তার নাই। কাজেই দিন দিন কংগ্রেসের কার্য্যে বাঙ্গালীর উৎসাহ কমিতে লাগিল, একবার তাহার উৎসাহের নদীতে ভাটা পড়িলে, আর জোয়ার আসা কঠিন। সুখেন্দুরও কংগ্রেসের কার্য্যে নানা বাধা ও বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িতে লাগিল। সে গৃহস্থদের কাছে অর্থভিক্ষা করিতে যায়, তাহারা নানা উপদেশ দিয়া দুই চারিটা কঠিন কথা শোনাইয়া বিদায় দেয়; তাহারা বলে, "বাপু, তোমাদের কংগ্রেস ত কিছুই করিবে না, সব বন্ধ করিয়া দিল, অর্থ কেন দিব?" সুখেন্দু গ্রামে চাষাদের কাছে যায়, তাহারা বলে—"বাবু, এই বুঝি স্বরাজ, ঘরে বসিয়া স্বরাজ লইবে নাকি?" সুখেন্দু প্রতি গৃহস্থের দ্বারে, প্রত্যেক চাষার বাটীতে ঘুরিল, ক্বচিৎ দুই এক স্থান ব্যতীত আর কোথায়ও অর্থ বা মুষ্টিভিক্ষা পাইল না। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা না খাইতে পাইয়া অসুস্থ হইয়া বাড়ী চলিয়া গেল, জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বাঁচিয়া থাকার মত বেতন না পাইয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিল। তবুও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুখেন্দু সাহসে বুক বাঁধিয়া সাধ্যমত কংগ্রেসের কার্য্য করিয়া চলিল। কিন্তু আর ত চলে না, না খাইতে পাইয়া, যা তা খাইয়া সুখেন্দুর নানা রোগ দেখা দিল। ক্রমে অসুস্থ হইয়া সে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। বন্ধু সমরনাথ

সংবাদ পাইয়া সুখেন্দুকে নিজের বাটীতে কলিকাতায় লইয়া আসিল। সেখানে বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর যত্নে ও সেবায় প্রায় একমাস ভুগিয়া সুখেন্দু আরোগ্যলাভের পথে আসিয়াছে।

দুই

মধ্যরাত্রে খাটের উপর অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় সুখেন্দু মনে মনে তাহার জীবনের আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলির আলোচনা করিতেছে। অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া সুখেন্দু একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; সঙ্গে সঙ্গে এই কয়টী কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—"না, কিছুই হইল না, জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় ছুটিলাম, তাহার প্রতিদান কি এই দিলে প্রভু?" আবার সে চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—"আমি আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটী করি নাই, ইহাই আমার তৃপ্তি। তবে যে লোকে বলিত দেশ জাগিয়াছে, দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি হইয়াছে, এ সবই মিথ্যা, একদম মিছে কথা। ভারতবাসী মিথ্যার এ জয় আর দেখাইও না।" উষ্ণমস্তিষ্কে এতগুলি কথা বলিয়া ক্লান্ত হইয়া সুখেন্দু শুইয়া পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল—"যে দেশে উচ্চবংশীয়া রমণীরা নিজেদের গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া দেশের জন্য লাঞ্ছনা ও কারাবরণ সহ্য করিলেও দেশের যুবকেরা শুনিবামাত্র সব ছাড়িয়া দেশের কাজে ছুটিয়া আসিতে না পারে

তাহার সম্বন্ধে এতটা আশা করা আমার অন্যায় হইয়াছে বটে!" উত্তেজনায় বিছানায় শুইয়া শুইয়া সুখেন্দু কাঁদিয়া ফেলিল। মনটা যখন বড়ই অশান্ত হইয়া পড়িল, তখন মাথার শিয়রের কাছ হইতে একটুকরা কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিল। দেশের কাজে নিযুক্ত হইয়া গর্ভধারিণী মা ছাড়া সুখেন্দু যাহাকে মা বলিয়া জানিয়াছে, ইহা তাঁহারই লেখা। যখনই মনটা অশান্ত হইত, তখন সুখেন্দু সেই কয়েকটা লাইন পাঠ করিতে করিতে মনে অসীম উৎসাহ পাইত। কাগজখানিতে লেখা ছিল—

"লক্ষ্মীর কোমল কর পল্লবপরশে,
অনন্ত শয়নে আছ নিদ্রার আবেশে,
হৃতা লক্ষ্মী দেখ আজ মেলিয়া নয়ন,
প্রলয় পয়োধি জলে জাগ নারায়ণ।"

সেই মায়ের এই কয়টা কথা সুখেন্দুর জপমন্ত্র হইয়াছিল। যখনই সে এই কয়টা কথার আবৃত্তি করিত, তখনই তাহার আশা হইত এই প্রলয় পয়োধিজলে এইবার বুঝি নারায়ণ জাগিবেন। সুখেন্দুর মনে আবার উৎসাহ আসিল, সে ভাবিয়া স্থির করিল আবার সে কার্য্যক্ষেত্রে নামিবে, আবার দেশের কাজ করিতে ছুটিবে, প্রাণ যদি যায়, তাহাও সে গ্রাহ্য করিবে না।

ক্রমে সুখেন্দু সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল। কার্য্যক্ষেত্রে নামিবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। সে ভাল হইয়া শুনিল উত্তরবঙ্গ বন্যার প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে, গ্রামবাসীদের বাড়ীঘর

সব পড়িয়া গিয়াছে, গরু ছাগল মরিয়া যাইতেছে, অন্নবস্ত্রহীন অবস্থায় গ্রামবাসীরা মৃত্যুর অপেক্ষায় ধুঁকিতেছে। পরে সে আরও শুনিল, উত্তরবঙ্গবাসীদের সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন, দলে দলে বাঙ্গলার যুবকেরা স্বেচ্ছাসেবক হইয়া যাইতেছে। সুখেন্দু ভাবিল বাঙ্গলার যুবকেরা কাজ পাইয়া আবার বুঝি জাগিল, কাজের নেশায় আবার তাহাদের উৎসাহের জোয়ার বুঝি ফিরিয়া আসিল। আনন্দে ভরপুর হইয়া শরীর সারিতে না সারিতেই সুখেন্দু বন্যার সাহায্য সমিতির উদ্যোক্তৃগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাহা কিছু প্রয়োজন ছিল লইয়া সান্তাহার সাহায্যকেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হইল।

তিন

সুখেন্দু সান্তাহারে আসিয়া পৌঁছিল। চারিদিকে তখন জল থৈ থৈ করিতেছে। সম্মুখের পাকা রাস্তাগুলিও এমন জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে যে একপদ নড়িতে হইলেও নৌকার সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। অন্য দুই চারিজন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত নৌকায় চড়িয়া সুখেন্দু ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রামগুলির অবস্থা দেখিতে লাগিল। মানুষের এত বড় দুর্দ্দশা বুঝি সে আর কখনও দেখে নাই, প্রায় গ্রামই একেবারে গৃহশূন্য হইয়া গিয়াছে, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানি চালাঘর লোকালয়ের সাক্ষীস্বরূপ হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বাকী সব চালাঘরের বাঁশ খুটি, চাল সবই ভাসিয়া গিয়াছে। গৃহস্থদের দুরবস্থার চরম হইয়াছে, তাহাদের চৌকী বিছানা বস্ত্র, তৈজস

সবই সেই বন্যার তাণ্ডবনৃত্যের সহচর হইয়া কাহার সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে, কে জানে। কোথায়ওবা উচু খুঁটির উপর মাচা বাঁধিয়া গ্রামবাসীরা রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, আবার কোথায়ওবা উচ্চ বৃক্ষের ডালে ডালে বাসা বাঁধিয়া তাহারা মানুষের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত সম্পর্কটা ঝালাইয়া লইয়াছে। এতবড় দুর্দ্দশার মধ্যে সুখেন্দু ও তাহার সহচরেরা চাল ডাল ও বস্ত্র বিলাইতে বিলাইতে চলিল এবং সকল স্থানেই গ্রামবাসীদের এই বিরাট দুঃখ দেখিয়া একহাতে অশ্রু মোচন করিত আর এক হাতে অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইত। গ্রামবাসীরাও সাহায্যকারীদের নৌকা দেখিলেই গান্ধীমহারাজের লোক আসিয়াছে স্থির করিয়া আপনাদের দুঃখ দারিদ্র্য রোগ অভাবের কথা আসিয়া জানাইত এবং সুখেন্দু ও তাহার সহচরেরা সেইখানেই বুক দিয়া পড়িত। একদিন সুখেন্দু দেখিল একটা গাছের ডালে একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করিয়া অতি সন্তর্পণে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সুখেন্দু তখনই গাছে উঠিয়া সেই রমণী ও তাহার সন্তানের থাকিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। এমনিভাবে চারিদিকের গ্রামগুলির মোটামুটি অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া সুখেন্দু কয়েকটী সহকর্ম্মীর সহিত দুইচারিটী গ্রাম লইয়া একটী সাহায্যকেন্দ্র গঠন করিয়া লইল। সেখানে তাহারা গ্রামবাসীদের যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে চারিদিকের জল যখন শুকাইয়া উঠিল, তখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকার প্রকোপ

দেখা দিল। সাহায্যসমিতির চিকিৎসকেরা আসিয়া ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা করিতে লাগিল, আর সুখেন্দুর দলের স্বেচ্ছাসেবকেরা রোগীদের শুশ্রূষার ভার লইল। গ্রামবাসীদের এই বিপদে সুখেন্দু আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাহাদের সেবায় উৎসর্গ করিয়া দিল। একদিন একটী দরিদ্র গ্রাম্য রমণীর অসুখের কথা শুনিয়া সুখেন্দু তাহার চালাঘরে ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সেবা করিবার লোকের অভাবে স্ত্রীলোকটী মলমূত্রে অপরিষ্কৃত বস্ত্রখানিও ছাড়িতে পারে নাই, আর তাহার শিশুসন্তানটী মাতার কোলের নিকট সেই অপরিষ্কারের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। সুখেন্দু আসিয়াই স্ত্রীলোকটীর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া সেই স্থানটী পরিষ্কৃত করাইল, তারপর তাহাকে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পাঠাইয়া দিয়া সেই ছেলেটীকে লইয়া আসিল। ছেলেটী মায়ের কাছে যাইবার জন্য কত কাঁদাকাটি করিতে লাগিল, কিন্তু সুখেন্দু তাহাকে সমস্ত সময় কোলে কোলে রাখিয়া আদর করিয়া মায়ের কথা ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ছেলেটী সুখেন্দুর কোলে মলমূত্র ত্যাগ করিতেছিল, সুখেন্দুর তাহাতে ভ্রূক্ষেপই নাই; সে চুমু খাইয়া আদর করিয়া তাহাকে কোলে লইয়া আহার করায়, ঘুম পাড়ায়, আর এক একবার তাহাকে তাহার মাকে দেখাইয়া আনে। এই সময়ে সুখেন্দুকে দেখিলে মনে হইত, যেন স্বর্গ হইতে অমৃতের ধারা লইয়া কোনও দেবদূত নামিয়া আসিয়াছে।

এইরূপে সেবার মধ্যে যখন সে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, তখন হঠাৎ একদিন সে শুনিল, নিকটের এক গ্রামের জমীদার

গ্রামবাসীদের উপর নোটিশ জারি করিয়াছেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের বছরকার পাওয়ানাগণ্ডা শোধ করিয়া দিতে না পারিলে, তিনি তাহাদের যাহা কিছু অবশিষ্ট জিনিষ পত্র আছে, তাহাই ক্রোক করিবেন। কথাটা শুনিয়া সুখেন্দুর রাগে ঘৃণায় সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, সে ভাবিল মানুষ কেমন করিয়া এমন হৃদয়হীন হয় যে প্রজাদের এই দুর্দ্দশায়ও সে আপনার কড়াগণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। সুখেন্দু তখনি সেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গ্রামবাসীরা দলে দলে তাহার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল—"বাবু, এইবার আমাদের জমীদারের হাত হইতে রক্ষা করুন।" সুখেন্দু বলিল—"কেন, তোমরা নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করিতে পার না?" তাহারা উত্তর দিত—"আপনি বলেন কি বাবু, আমরা দুর্ব্বল, বুদ্ধিহীন, আমরা প্রবলপ্রতাপান্বিত বুদ্ধিমান্ জমিদারের সঙ্গে কেমন করিয়া পারিব?" সুখেন্দু তাহাদের বুঝাইয়া বলিত—"তোমরা যদি দুর্ব্বল হও, তবে বলবান্ কে? তোমরা শিক্ষার অভাবে এখনও বুঝিতে পারিতেছ না যে তোমরাই আসল বলের আধার। তোমরা লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিয়া আমাদের খাওয়াও বলিয়াইত আমরা খাইতে পাই, তোমরা শ্রমজীবীর দল আমাদের বাঁচাইয়া রাখ বলিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকি। তোমরা বুঝিয়া দেখ যে তোমরাই পৃথিবীর মালিক, আজ যাহারা তোমাদের অজ্ঞতার সুবিধা বুঝিয়া তোমাদিগকে ঠকাইয়া খাইতেছে, তাহারা একদিন তোমাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হইলে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবেই—

এ কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানিও। পৃথিবীর অন্যত্রও এ জাগরণ আসিতেছে।” গ্রামবাসীরা সুখেন্দুর সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিত, তবে এইটুকু বুঝিতে পারিত যে বাবুটী তাহাদের মঙ্গলের জন্যই এত কথা বলিতেছে। সুখেন্দু ভাবিত, হায়রে কি অজ্ঞতায় না ইহাদের নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে এ বিষয়ে বড়ই মাতিয়া উঠিয়াছিল, তাই কথায় কথায় সহকর্মীদের নিকট বলিত—

“এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ;
ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির
একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।”

সুখেন্দুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বন্ধুরা চঞ্চল হইয়া পড়িল।

ক্রমে গ্রামবাসীদের জিনিষপত্র ক্রোকের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুখেন্দু প্রজাদের মধ্যে গিয়া তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বিষয় উপদেশ দিতে লাগিল। তাহারা প্রথম প্রথম অতটা করিতে সাহস করিল না, সুখেন্দুর কথার উত্তরে বলিত—“বাবু, জমীদারের সঙ্গে পারব কেন? ধরে জেলে পুরে দেবে যে।” সুখেন্দু উত্তেজিত হইয়া বলিত—“জনকতক জেলে যাবে বলে এত বড় অপমান চিরকাল

সয়ে থাকবে? তার চেয়ে মরাও যে ভাল।” সুখেন্দু তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল যেন জমীদারের লোকজনকে কেহ কোনওরূপ বাধা না দেয় কেহ কোনওরূপ মারামারি বা গালাগালি না করে। যেন নির্ব্বিবাদে সব ছাড়িয়া দেয়। ক্রমে গ্রামবাসীরা সুখেন্দুর নেতৃত্বে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিতে সম্মত হইল। ক্রোকের দিন সুখেন্দু জনকতক গ্রামবাসী প্রজাদের লইয়া গান গাহিতে গাহিতে পথে বাহির হইল—

“ওম্ সত্যম্ হরি ওম্,
জয় শুদ্ধির, জয় খদ্দর, জয় সত্যের জয় জয়!
আজি ভারতের মহাযজ্ঞের
ত্যাগ হুতাশনে ঢালো হোম!
চাই স্বাধীনতা, চাই মানবতা, চাই আত্মার পরিচয়।
বল পরাজয় হোক অসতের—
ওম্ সত্যম্ হরি ওম্।”

প্রজাদের জিনিষপত্র নিলামে উঠিল, কিন্তু গ্রামে ক্রেতা জুটিল না। জিনিষপত্র তুলিবার জন্য গরুর গাড়ী পাওয়া গেল না, মোট-বাহীদের চিহ্নও গ্রামে দেখা গেল না। নিরুপায় হইয়া জমীদার প্রজাদের সহিত মিটমাট করিয়া লইলেন। চারিদিকে সুখেন্দুর জয় জয়কার পড়িয়া গেল। কিন্তু এই দারুণ অপমানে সুখেন্দুর উপর জমীদার মহাশয়ের বিজাতীয় ক্রোধের উৎপত্তি হইল। ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি সুখেন্দুকে শান্তিভঙ্গের অপরাধে

কারারুদ্ধ করাইলেন। যেদিন পুলিসে সুখেন্দুকে ধরিয়া লইয়া গেল, সেদিন গ্রামবাসীরা তাহার একবার দর্শন পাইবার জন্য দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু সুখেন্দুর উপদেশে তাহারা বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। বগুরার ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে সুখেন্দুর তিনমাস কারাদণ্ড হইয়া গেল।

চার

জেলে আসিবার পর প্রথম প্রথম সুখেন্দুর কিছুতেই সময় কাটিতে চাহিত না। কিন্তু অতি অল্পদিনেই সে সাধারণ কয়েদীদের সহিত বেশ আলাপ জমাইয়া লইল। সে এখন তাহাদের প্রত্যেকের অদ্ভুত চুরির ইতিহাস শোনে. কেমন করিয়া একজন কয়েদী নবাব-পুত্র সাজিয়া জনশূন্য নবাবের বাড়ী হইতে বহুমূল্য আসবাবপত্র চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া আর একজন দড়ির মই বাঁধিয়া দোতলার ঘর হইতে গহনার বাক্স সরাইয়াছিল—এইসব চোরেদের কাহিনী শুনিয়া সুখেন্দু তাহাদের বুদ্ধির প্রখরতায় চমৎকৃত হইয়া যায়। সে মাঝে মাঝে তাহাদিগকে সদুপদেশ দেয়, ভাল পৌরাণিক গল্প শোনায় এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে সৎপথে চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয়। এইরূপভাবে সুখেন্দুর দিনের বেলাটা মন্দ কাটিতেছিল না; কিন্তু ছয়টার সময় দরজা বন্ধ করিবার পর একাকী বসিয়া থাকিলেই তাহার যত ভাবনা আরম্ভ হইত। তখন তাহার ভাবনার কুলকিনারাই থাকিত না। প্রথমেই

তাহার ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়িত, তাহার চিরসহচর দুঃখদারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া সে বড় হইয়াছে, কত কষ্টে তাহাকে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। শৈশব হইতেই তাহার কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছিল, এখন সে সকল স্বপ্নের মত মনে হইতেছে। তারপর বন্ধু সমরনাথের কথা তাহার মনে পড়িত। কত আদরে কত যত্নে বন্ধু তাহার সেবা করিয়া আসিয়াছে। তেমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা সে বুঝি আর কোথায়ও পায় নাই, সেই বন্ধুকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইত। জেলে আসিবার পর একবার বন্ধু আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রাণের পিপাসা মিটে নাই। তারপর তাহার মনে পড়িত জীবনের একটা অতি বড় গোপনীয় কথা, যাহার সন্ধান বন্ধু সমরনাথ ভিন্ন আর কেহই জানিত না। সে অনেকদিনের কথা, সুখেন্দুর নীরস জীবনে ফল্গুর মত বহিয়া আসিয়াছিল একটা গোপন প্রেমের কাহিনী। অতি শৈশবেই প্রতিভার সহিত সুখেন্দুর আলাপ হয়, সে যেন কোন্ স্বপ্নলোকের কথা। সুখেন্দুর তখন সতের বৎসর, প্রতিভা তখন মাত্র নয় বৎসরের বালিকা। সে যেন কবি দান্তের হঠাৎ বিয়াত্রিচির সহিত সাক্ষাৎ এবং সেই সাক্ষাতেই উভয়ের হৃদয় বিনিময়। কতদিন সুখেন্দু সেই স্মৃতির পূজা করিয়াছিল, তারপর একদিন চকিতে সংসারের কোলাহলময় পথে তাহাদের পুনরায় সাক্ষাৎ। প্রতিভা তখন পরের স্ত্রী। কিন্তু তাহার অল্পদিন পরেই সুখেন্দু শুনিতে পাইল প্রতিভা এই কঠিন ধরার বসবাস উঠাইয়া লইয়া

গিয়াছে। সেই হইতেই সুখেন্দু আপনাকে সম্পূর্ণরূপে পরের সেবায় সমর্পণ করিয়াছে, যেন ইহারদ্বারা সে পরজন্মে প্রতিভার যোগ্য হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আর একটী মধুর স্মৃতি অবসর সময়েই সুখেন্দুর মনে জাগিত। তাহা এক মহিয়সী মহিলার স্নেহমণ্ডিত মুখখানি সুখেন্দু এই মহিলাটীকে মায়ের মত দেখিত, তিনিও ইহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। সুখেন্দুর যখনই যাহা কিছু কষ্টের কারণ হইত, সে তখনি তাহা সেই মাতৃতুল্য মহিলাটীর নিকট জ্ঞাপন করিত। এইরূপে শত ভাবনার মধ্য দিয়া সুখেন্দুর কারাজীবন শেষ হইয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি তাহার কারামুক্তির সময় হইয়া আসিয়াছে কিন্তু সুখেন্দুর মনে একটা অবসাদের ভাব জাগিয়াছিল। সে মুক্তিলাভ করিয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাই মনের সকল কথা খুলিয়া সে তাঁহার সেই মায়ের নিকট একখানি পত্র লিখিল, তাহাতে সে আপনাকে বড়ই অযোগ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল। চিঠির উত্তর আসিল, তাহার একস্থানে লেখা ছিল—"সংসারের সকলেরই প্রয়োজন আছে। একজনের কাছে যে অযোগ্য, অন্যের নিকট সে খুবই যোগ্য হইতে পারে। সুতরাং নিজেকে এতটা ক্ষুদ্র ভাবিস্ না। মনকে এতটা অবসন্ন হতে দেওয়া কারও উচিত নয়। কারামুক্ত হলেই আমার সঙ্গে দেখা করিস্।" চিঠিখানি পড়িয়া সুখেন্দু অন্যমনস্ক হইয়া কত কি ভাবিতেছিল, এমন সময়ে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া সংবাদ দিলেন—"সুখেন্দু বাবু, আজ আপনার মুক্তি।"

—•:•:—